

# রায়ে হাকীকত

[প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন]

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী  
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্নী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

“হে আল্লাহ! হে হেদায়াতের আলোর উৎস! তোমার  
অপার অনুগ্রহে এ উম্মতের চোখ খুলে দাও।  
উদযাপিত এ তত্ত্বের দিকে হে সত্যাবেষী! এক নজর তাকাও  
যাতে অলীক ধ্যান-ধারণা ও সন্দেহ সংশয় থেকে মুক্তি পাও।”  
-প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

## রায়ে হাকীকত

[প্রকৃত তত্ত্ব উদযাপন]

পুস্তকটিতে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের সঠিক ঘটনাবলী  
এবং ঘোষণাকৃত মুবাহালা সম্পর্কে কিছু হিতোপদেশ ও  
এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে।

হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ  
প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা

বঙ্গানুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ  
মুরব্বী সিলসিলাহ

<u>প্রকাশক</u>	আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা ১২১১
<u>গ্রন্থস্তুতি</u>	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি.
<u>অনুবাদ</u>	মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্
<u>মূল উর্দু প্রকাশকাল</u>	নভেম্বর, ১৮৯৮
<u>প্রথম বঙ্গানুবাদ</u>	অক্টোবর, ২০০২
<u>পুনর্মুদ্রণ</u>	এপ্রিল, ২০১২
<u>সংখ্যা</u>	২০০০ কপি
<u>মুদ্রণে</u>	ইন্টারকন এসোসিয়েটস্ ৫৬/৫ ফকিরেরপুর বাজার মতিঝিল, ঢাকা
<u>Title</u>	<b>Raz-e-Haqiqat</b>
<u>Writer</u>	<b>Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian</b> Promised Messiah & Mahdi <sup>as</sup>
<u>Bengali Translation</u>	<b>Maulana Ahmad Sadiq Mahmud</b> Murabbi Silsilah (Retd.)
<u>Published by</u>	Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© Islam International Publications Ltd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ভূমিকা

‘রায়ে হাকীকত’ পুস্তকটি প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় প্রণয়ন করেন। এতে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং ঐতিহাসিক দলিল-প্রমাণ ও তত্ত্ব-তথ্যের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবনের প্রকৃত ঘটনাবলী তুলে ধরে প্রমাণ করেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ক্রুশ-বিদ্ব হয়ে নিহত হন নি, বরং ক্রুশ থেকে উদ্বার পেয়ে সুস্থাবস্থায় ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করেন এবং বিভিন্ন দেশ সফর করে ভারতবর্ষে আসেন। অবশেষে তিনি কাশ্মীরে ১২০ বিশ বছর বয়সে ইস্তেকাল করেন ও শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় সমাহিত হন। সেখানে তার ঐতিহাসিক সমাধি রয়েছে। এ পুস্তকে সে সমাধির নকশাসহ বিশদ তত্ত্ব-তথ্যাদি সম্বলিত তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়েছে যা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের ভাস্ত ও ভিডিহীন ধ্যান-ধারণাগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে।

এছাড়া, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে মুবাহালা ঘোষণা করেছিলেন এ পুস্তকটিতে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তুলে ধরে তার জামাতকে কিছু জরুরী উপদেশ দান করেন। আর সেই সাথে মৌলবী মোহাম্মদ হসেন বাটালবী ও তার সাথীদের কিছু আপত্তির উত্তর অত্যন্ত যুক্তি-যুক্ত ও জোরালোভাবে প্রদান করেন।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এখন এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। উর্দু ভাষায় প্রণীত ‘রায়ে হাকীকত’ পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেছেন মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ এবং দেখে দিয়েছেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ। প্রক্রিয়াজীবন যথারীতি জনাব মোহাম্মদ মুত্তিউর রহমান সাহেব সাহায্য করেন। আল্লাহ্ তাআলা এ পুস্তকটির প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে পুরস্কৃত করুন।

অবশেষে বিনীত দোয়া, আল্লাহ্ তাআলা যেন পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দের জন্য হেদায়াত ও ঈমান বৃদ্ধির কারণ করেন। আমীন ॥  
ওয়াসসালাম।

খাকসার

শাহজাহান

মীর মোহাম্মদ আলী  
ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ



مبارا دل آں فرو مایہ شاد کہ از بہر دنیا و ہر دل ببلو"

আমি আমার জামাতের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি তারা যেন ‘ইশাআতুস সুন্নাহ’ পত্রিকার প্রকাশক শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও তার দুই সহকারীর সম্পর্কে মুবাহালাস্বরূপ ২১, নভেম্বর ১৮৯৮ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ফলাফলের জন্য অপেক্ষমান থাকেন যার মেয়াদকাল ১৫ জানুয়ারি, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে শেষ হবে।

এ প্রসঙ্গে আমি আমার জামাতকে উপদেশস্বরূপ কিছু কথা বলছি: তারা যেন দৃঢ়ভাবে তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি ভালবাসা)-এর পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে কটু কথার উভরে কটু কথা না বলেন ও গালির উভরে গালি না দেন। তারা অনেক হাসি বিদ্রূপের কথা শুনতে পাবেন যেমন শুনছেন, কিন্তু তাদের নীরব থাকা, তাকওয়া ও সৎকর্মপরায়ণতার সাথে খোদা তাআলার মীমাংসার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা উচিত। যদি খোদা তাআলার দৃষ্টিতে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য হতে চান তাহলে সত্যপরায়ণতা, তাকওয়া ও ধৈর্যশীলতাকে যেন হাত ছাড়া হতে না দেন। এখন মকদ্দমার নথি-পত্র সেই আদালতের সামনে রয়েছে যা কারও পক্ষ সমর্থন করে না, আর ঔদ্বত্যের আচার-আচরণও পছন্দ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আদালত কক্ষের বাইরে থাকে যদিও তার পাপের জন্যও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যক্তির অপরাধের শাস্তি অনেক কঠোর, যে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে ঔদ্বত্য দেখিয়ে অপরাধ করে। সেজন্য আমি তোমাদেরকে বলি, খোদা তাআলার আদালতের অবমাননাকে ভয় কর। ন্যূনতা, বিনয়, ধৈর্য ও তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং খোদা তাআলার কাছে চাও তিনি যেন তোমাদের ও তোমাদের জাতির মাঝে ফয়সালা করে দেন।

**একটি ঘোষণা :** ডিসেম্বর মাসে ছুটির দিনগুলিতে (সালানা) জলসা অনুষ্ঠিত হতো, কিন্তু এবার এ মাসে আমি নিজে ও আমার স্ত্রী এবং অধিকার্ণ নারী ও পুরুষকর্মী মৌসুমী রোগ ব্যাধিতে অসুস্থ বিধায় মেহমানদের সেবা-যত্ন ও আপ্যায়নে বিষ্ণু ঘটবে। আরও কিছু কারণ রয়েছে যা লিখলে কলেবর বৃদ্ধির কারণ হবে সেজন্য ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, এবার জলসা হবে না। আমাদের সকল ভাতা এ সবক্ষে অবহিত থাকুন। ওয়াস সালাম, ঘোষণাকারী -মির্বা গোলাম আহমদ

তোমাদের পক্ষে শেখ মুহাম্মদ হুসেন ও তার সঙ্গীদের সাথে কখনও সাক্ষাৎ না করাই উত্তম। কেননা প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ বাগড়া বিবাদ ঘটার কারণ হয়ে যায়। আরও উত্তম হবে যদি তোমরা এ সময়টিতে কোন তর্ক বিতর্কও না কর। কেননা তর্ক-বিতর্কে কথা-বার্তায় তীব্রতা ও উভেজনার সৃষ্টি হয়। অবশ্যই তোমাদের জন্য সংকর্মশীলতা, সত্যবাদিতা ও খোদা ভীরুতায় এগিয়ে যাওয়া আবশ্যিক। কেননা যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, খোদা তাদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না।

দেখ, হ্যরত মুসা নবী (আ.), যিনি তাঁর যুগে সবচেয়ে বেশি সহনশীল ও তাকওয়াপরায়ণ ছিলেন তিনি তাকওয়ার কল্যাণে ফেরাউনের ওপরে কিরণ বিজয়ী হয়েছিলেন! ফেরাউন তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু মুসা (আ.)-এর চোখের সামনে খোদা তাআলা ফেরাউনকে তার সমস্ত বাহিনীসহ ধ্বংস করলেন। তারপর হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সময়ে দুর্ভাগ্য ইহুদীরা তাঁকে ধ্বংস করতে চাইল শুধু তাই নয়, বরং তাঁর পবিত্র আত্মার উপর লান্তরে কলঙ্ক লেপন করতে চাইল। কেননা তাওরাতে লিখা ছিল, যে ব্যক্তি কাষ্ঠে অর্থাৎ ক্রুশে বিন্দ হয়ে মারা যায় সে লান্তী (অভিশঙ্গ) হয় অর্থাৎ তার আত্মা কলুষিত, অপবিত্র; সে খোদার নৈকট্য হতে দূরে এবং ঐশ্বী দোরগোড়া হ'তে বিতাড়িত ও শয়তান সদৃশ। আর এজন্যই ‘লায়ীন’ (অভিশঙ্গ) শয়তানের নাম। সুতরাং হ্যরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে ঐ অযোগ্য জাতি এমন এক জগন্য পরিকল্পনার কথা চিন্তা করলো, যা বাস্তবায়নের দ্বারা তারা যেন সাব্যস্ত করতে পারে যে, তিনি পবিত্রাত্মা, খোদার প্রিয় ও সত্য নবী ছিলেন না। কেননা তিনি নাউয়ুবিল্লাহ অভিশঙ্গ অর্থাৎ তাঁর আত্মা কিনা অপবিত্র, বরং লান্ত শব্দের দ্বারা যা বুজায়, সে অনুযায়ী তিনি মনে প্রাণে খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং খোদা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু কাদের (সর্বশক্তিমান) ও ‘কাইউম’ (সংরক্ষণকারী) খোদা অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইহুদীদেরকে ঐ ইচ্ছা প্রৱণে বিফল মনোরথ করেন এবং তাঁর নবীকে (আ.) ক্রুশীয় মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। বরং তাঁকে একশ’ বিশ বছর\* পর্যন্ত জীবিত

\* টীকা : সহী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হ্যরত ঈসা (আ.) একশ’ বিশ বছর আয়ু লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইহুদী ও শ্রীষ্টানদের সর্বসম্মত মতে ক্রুশের ঘটনা যখন ঘটে, তখন হ্যরত ঈসা (আ.)-এর বয়স ছিল মাত্র তেওঁশি (৩৩) বছর। এ দলিল-প্রমাণ থেকে সুস্পষ্ট জানা যায় যে, হ্যরত ঈসা (আ.) ক্রুশ থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে উদ্ধার পাওয়ার পর অবশিষ্ট জীবন ভ্রমণ ও পর্যটনে অতিবাহিত করেছিলেন। সহী হাদীসাবলম্বনে এ প্রমাণও রয়েছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) ছিলেন ‘সাইয়াহ’ অর্থাৎ ভ্রমণ ও পর্যটনকারী নবী। অতএব যদি তিনি ক্রুশীয় ঘটনায় সশরীরে আকাশে চলে গিয়ে থাকেন তাহলে ভ্রমণ (সিয়াহাত) কোন সময়ে করলেন? অথচ আভিধানিকগণও ‘মসীহ’ শব্দের একটি তাৎপর্য এটাই বর্ণনা করেন যে, এ শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে ‘মাসাহ’ (ধাতু) থেকে এবং ‘মাসাহ’ সিয়াহত (ভ্রমণ বা পর্যটন)-কে বলা হয়। তাছাড়া এ

ରେଖେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରୀକେ ତା'ର ଜୀବନ୍ଦଶାୟଇ ଧର୍ମ କରେନ । ତବେ ଅତୀତେ ଏମନ କୋନାଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଅଧିକାରୀ ନବୀ ହନ ନି ଯିନି ଜାତିର ନିର୍ଯ୍ୟାତନେର କାରଣେ ହିଜରତ କରେନ ନି, ଖୋଦା ତାଆଲାର ଚିରନ୍ତନ ଏ ସୁନ୍ନତ (ରୀତି) ଅନୁୟାୟୀ ହସରତ ଈସାଓ (ଆ.) ତିନ ବହରବ୍ୟାପୀ ତବଳୀଗେର ପର କୁଶୀଯ ଫେତନା (ପରୀକ୍ଷା) ଥେକେ ରଙ୍କା ପାଓୟାର ପରେ ପରେ ଭାରତବର୍ଷେ ଦିକେ ହିଜରତ କରେନ ଏବଂ ବୈଲନ ବିପର୍ଯ୍ୟରେ ସମଯେ ଭାରତବର୍ଷ, କାଶ୍ମୀର ଓ ତିବବତେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଁ ଆସା ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋତ୍ରଗୁଲୋକେ ଖୋଦା ତାଆଲାର ବାର୍ତ୍ତା ପୌଛେ ଦିଯେ ଅବଶେଷେ ଭୃ-ସ୍ଵର୍ଗ କାଶ୍ମୀରେ ଇଞ୍ଚେକାଳ କରେନ ଓ ଶ୍ରୀନଗରେ ଖାନିଆର ମହଲ୍‌ଭାୟ ସସମାନେ ସମାହିତ ହନ । ତା'ର ମାଯାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ (ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ) । ମାନୁଷ ତା ଯିଯାରତ କରେ ଏବଂ ତା ଥେକେ ବରକତ ଲାଭ କରେ ଥାକେ ।

ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହେତୁକ ବଲେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ, ଖୋଦା ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେର ହାତ ଥେକେ ରଙ୍କା କରାର ଜନ୍ୟ ହସରତ ଈସାକେ (ଆ.) ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସମାନେ ପୌଛେ ଦିଯେଇଲେନ । କେନନା ଖୋଦାର ଏ କାଜର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେରକେ ଆଦୌ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟନ୍ତ କରା ଯାଇ ନା । ଇନ୍ଦ୍ରୀରା ତୋ ତା'କେ ଆକାଶେ ଉଠେ ଯେତେଓ ଦେଖେ ନି ଏବଂ ଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'କେ ନାମତେଓ ଦେଖେ ନି । ଅତ୍ୟବ ତାରା ଏ ଅର୍ଥହିନ, ଆଜଞ୍ଚବୀ ଓ ପ୍ରମାଣବିହିନୀ କେଚ୍ଛାକେ କି କରେ ମାନତେ ପାରେ? ତାହାଡ଼ା ଏ-ଓ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଯେ, ଖୋଦା ତାଆଲା ତା'ର ମହିମାନ୍ତିର ରମ୍ଭ ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ ସଲାଲ୍‌ବାହ୍ ଆଲାଯାହେ ଓୟା ସାଲାମକେ ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେର ଚେଯେଓ ବେଶ ଦୁଃସାହସୀ, ଯୋଙ୍କା ଓ ବିଦେଶୀ କୁରାଯଶଦେର ଆକ୍ରମଣ ଥେକେ କେବଳ ଗୁହାର ଆଶ୍ରୟେ ରଙ୍କା କରଲେନ ଯା ମଙ୍କା ଥେକେ ତିନ ମାଇଲେର ବେଶ ଦୂରେ ଛିଲ ନା । ଅତ୍ୟବ ଖୋଦା ତାଆଲା କି ନାଟ୍ୟବିଲାହ କାପୁରୁଷ, ଯିନି ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଏତିହି ଭୟ ପେଯେଇଲେନ ଯେ ତା'ର ମନ ଥେକେ ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେର ହତ୍କେପେର ଖଟନା ଈସା (ଆ.)-କେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକାଶେ ପୌଛେ ଦେଇବ ଛାଡ଼ା ଦୂର ହତେ ପାରତେ ନା? ବରଂ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଡ଼ା କାହିନୀ, ଯା କୁରାମାନ କରିମେର ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରାଲୋ ଦଲିଲ-ପ୍ରମାଣେର ଦ୍ୱାରା ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟନ୍ତ । ଆମି ବର୍ଣନା କରେ ଏସେହି, କୁଶୀଯ ଘଟନାର ପ୍ରକୃତ ସରକ୍ଷ ସନାତ କରାର ଜନ୍ୟ [ଈସା (ଆ.)-ଏର କ୍ଷତ ନିରାମୟେ ବ୍ୟବହତ] ‘ମରହମେ ଈସା’ ନାମର ମଲମଟି ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭେର ଉପାୟ ଏବଂ ସତ୍ୟକେ ଜାନା ଓ ଚେଳାର ଏକଟି ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାମେର ସନଦ ଓ ଦଲିର ବଟେ । ଏ ବିଷୟେ ଆମି ଏଜନ୍ୟ ପୁରୋପୁରି ଓୟାକେବହାଲ ଯେ, ଆମାର ପିତା ମରହମ ମିର୍ୟା ଗୋଲାମ ମୁର୍ତ୍ତ୍ୟା, ଯିନି ଏ ଜେଲାର ଏକଜନ ସମ୍ଭାନ୍ତ ରଇସ (ପ୍ରଧାନ) ଛିଲେନ, ତିନି ଏମନ ଏକଜନ ଉଚ୍ଚଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ଛିଲେନ, ଯିନି ତା'ର ଜୀବନେର ପ୍ରାୟ ଘଟି ବହର ଏ ଅଭିଜ୍ଞତାଯ ଅତିବାହିତ କରେଇଲେନ ଓ ସଥାସନ୍ତର ଉପାୟେ ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେର ଦୂରିତ ଗ୍ରହଣିର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗର ସଂଘର୍ଷ କରେଇଲେନ । ଆମି ନିଜେ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରେର ବହି-ପୁଣ୍ଡକ ପଡ଼େଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏ ଗ୍ରହଣିଲୋତେ ମନୋନିବେଶ କରି । ସେଜନ୍ୟାଓ ଆମାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧ୍ୟଯନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଥେକେ ବର୍ଣନା କରାଇ ଯେ, ଏକ ହାଜାରେର ବେଶ ଏରାପ ଥିଲେ ରଯେଛେ ଏଣୁଲୋତେ ଉଚ୍ଚ ‘ମରହମେ ଈସା’ ଅର୍ଥାତ୍ ଈସାର ମଲମେର ଉଲ୍ଲେଖ ରଯେଛେ । ଏଣୁଲୋତେ ଏ-ଓ ଲିଖା ଆହେ ଯେ, ଏ ମଲମଟି ହସରତ ଈସା (ଆ.)-ଏର ଜନ୍ୟ ବାନାନୋ ହୟେଇଲ । ଏ ଗ୍ରହଣିଲୋର କୋନ କୋନଟି ଇନ୍ଦ୍ରୀଦେର ରଚିତ, କୋନ କୋନଟି ଶ୍ରୀଷ୍ଟାନଦେର ଏବଂ କୋନ କୋନଟି ମାଜୁସୀ (ପାର୍ସି) ଦେର ରଚିତ ଥିଲେ । ଅତ୍ୟବ ଏଟା ଏମନ ଏକ ଜ୍ଞାନମୂଳକ ଗବେଷଣାଲକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଯାତେ ନିଃସନ୍ଦେହେ ପ୍ରତୀଯମାନ ହୟ ଯେ, ହସରତ ଈସା (ଆ.) ଦୁଶେ ବିନ୍ଦ ହୟେ ନିହତ ହେଯା ଥେକେ ରେହାଇ ପେଯେଇଲେନ । ଯଦି ଇଞ୍ଜିଲ ରଚିତାରା ଏର ବରଖେଲାପ ଲିଖେ ଥାକେ ତାହଲେ ତାଦେର

অনুরূপ, খোদা তাআলা আমাদের প্রভু ও অভিভাবক নবীয়ে আখেরিজ্জামান মুহাম্মদ (স.)-কে যিনি ‘সৈয়্যদুল মুত্তাকীন’ (মুত্তাকীদের সর্দার) ছিলেন, অসংখ্য ধরনের সাহায্য সমর্থনের মাধ্যমে বিজয়ী করেন। যদিও প্রথম দিকে হ্যরত মুসা (আ.) ও হ্যরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় হিজরতের কষ্ট তাঁর ভাগ্যেও জুটে। কিন্তু সে হিজরতেই ঐশ্বী সাহায্য ও বিজয়ের মৌলিক উপাদানসমূহ নিহিত ছিল। অতএব হে বন্ধুগণ! নিচিং জেনে নিন, মুত্তাকীকে কখনও ধ্বংস করা হয় না। যখন দুঁটি দল পরম্পর শক্রতা করে ও বিবাদকে চরম সীমায় পৌঁছে দেয় তখন যে দলটি আল্লাহর দৃষ্টিতে তাকওয়াপরায়ণ (আল্লাহ-ভীরু) ও সংযমশীল হয়ে থাকে তাদের জন্য আসমান থেকে সাহায্য অবর্তীণ হয়। আর এরপে আসমানী সিদ্ধান্তের দ্বারা ধর্মীয় বিবাদের নিষ্পত্তি হয়ে যায়। দেখ, আমাদের প্রভু ও অভিভাবক আমাদের নবী মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিরূপ দুর্বল অবস্থায় মকায় আবিভূত হয়েছিলেন, আর আবু জাহল ইত্যাদি কাফেরদের কতো

---

সাক্ষ্য বিন্দু মাত্র আস্থাযোগ্য নয়। কেননা প্রথমত: ওরা কুশের ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল না, ওরা নিজেদের প্রভু ঈসার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা অবলম্বন করে সকলেই পালিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত: ইঞ্জিলগুলোতে প্রচুর স্ববিরোধ রয়েছে। এমন কি, বার্ণবাসের ইঞ্জিলে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর কুশে বিন্দু হয়ে মারা যাওয়াকে অস্থীকার করা হয়েছে। তৃতীয়ত: বড়ই বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত এ ইঞ্জিলগুলোতেও লিখা আছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) কুশের ঘটনার পর তাঁর হাওয়ারীদের (অর্থাৎ শিষ্যদের) সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর ক্ষতগুলো তাদেরকে দেখান। অতএব এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তখন তাঁর দেহে বিদ্যমান ক্ষতের জন্য মলম প্রস্তুত করার প্রয়োজন ছিল। কাজেই নিশ্চিত বুঝা যায় এ উপলক্ষ্মৈ সে মলম তৈরী করা হয়েছিল। ইঞ্জিলগুলো থেকে এ-ও প্রমাণিত যে, ঈসা (আ.) চল্লিশ দিন এই এলাকার আশে-পাশে গোপনে অবস্থান করেন। তারপর মলম ব্যবহারে যখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন তখন তিনি সফর অবলম্বন করেন।

আফসোস, রাওয়ালপিডির জনেক ডাক্তার সাহেব এক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। তাতে তিনি ‘ঈসার মলম’ সংক্রান্ত ব্যবস্থা-প্রাপ্তি যে বিভিন্ন জাতির প্রাণ্ডাদিতে বিদ্যমান তা অস্থীকার করেন। কিন্তু মনে হয়, হ্যরত ঈসা (আ.) কুশে বিন্দু হয়ে যে মারা যান নি, বরং ক্ষতবিক্ষত জীবিতাবস্থায় কুশ থেকে রেহাই পান- এ ঘটনাটি শুনে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন ও মনে করেন, তাতে প্রায়শিকভাবে সকল পরিকল্পনা বাতিল হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সকল থচ্ছে ‘মরহমে ঈসা’ এর ব্যবস্থা-প্রাপ্তি মজুদ রয়েছে সেগুলোর অতিতৃ সম্বন্ধে অস্থীকার করাটা বাস্তবিকই লজ্জাক্ষর। যদি তিনি সত্যাস্বী হয়ে থাকেন তাহলে আমার নিকট এসে যেন এই প্রহৃগুলো দেখে যান। বস্তুত: উক্ত ‘ঈসার মলম’ সংক্রান্ত জ্ঞানগত সাক্ষ্যটি যে এ সব (ভাস্ত) ধর্ম-বিশ্বাসকে রদ করে ও এতে প্রায়শিকভাব ও ত্বরান্বাদ ইত্যাদির সমষ্ট ইমারত নিমিষে ভেঙ্গে পড়ে, ত্রীষ্ণান্দের জন্য কেবল এ বিপদই নয় বরং ইন্দানিং উল্লেখিত প্রমাণের সমর্থনে আরো প্রমাণাদিও বেরিয়ে এসেছে। কেননা অনুসন্ধানে প্রমাণিত যে, হ্যরত মসীহ (ঈসা আ.) কুশীয় বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পেয়ে সুনিশ্চিত ভারতবর্ষের দিকে সফর করেন এবং নেপাল হয়ে অবশেষে তিব্বতে পৌঁছেন, তারপর কাশ্মীরে কিছু কাল অবস্থান করেন এবং বেবিলন বিপর্যয়ের সময় যে সকল বনী ইস্রাইলী গোত্র

প্রতিপত্তি ছিল! লক্ষ লক্ষ মানুষ আঁ হযরত (স.)-এর প্রাণের শক্তি হয়ে গিয়েছিল। তারপর তা কী ছিল যা পরিণামে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সফলতা ও বিজয় এনে দিয়েছিল? নিশ্চিত জেনো, তা ঐ সত্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও সততাই ছিল। অতএব হে ভাতাগণ! এপথে দৃঢ়পদক্ষেপে এগিয়ে চল এবং পথে অত্যন্ত জোরে-শোরে প্রবেশ করে। অতঃপর অচিরে দেখবে, খোদা তাআলা তোমাদের সাহায্য করবেন। সেই খোদা যিনি দৃষ্টির অন্তরালে গোপন রয়েছেন কিন্তু সব কিছুর চেয়ে অধিক উজ্জ্বল ও প্রকাশমান, যার জালাল ও প্রতাপকে ফেরেশতারাও ভয় করে। তিনি ধৃষ্টিতা ও চালাকীকে পছন্দ করেন না। যারা তাঁকে ভয় করে তাদের প্রতি তিনি দয়া করেন। অতএব তাঁকে ভয় কর ও প্রত্যেক কথা বুঝে সুবে বল। তোমরা হচ্ছ

বিতাড়িত হয়ে কাশ্মীরে বসবাসরত ছিল তাদেরকে হেদায়াত দান করেন, অবশেষে একশ” বিশ্ব বছর বয়সে শ্রীনগরে ইঙ্গেকাল করেন ও খান ইয়ার মহল্লায় সমাহিত হন। ভুল জনশ্রুতিতে তিনি ইয়োয়া আসফ\* নবী নামে প্রসিদ্ধি পেয়ে যান। এ ঘটনার সমর্থন সে ইঞ্জিলও করে যা সম্প্রতি তিরবত থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ইঞ্জিলটি অনেক চেষ্টায় লওনে পাওয়া গিয়েছে। আমাদের আন্তরিক নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী বন্ধু শায়খ রহমতুল্লাহ সাহেব প্রায় তিনি মাস যাবৎ লভনে অবস্থান করে এ ইঞ্জিলটি তালাশ করতে থাকেন, অবশেষে পেয়ে যান। এ ইঞ্জিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলীর একটা অংশ বিশেষ। বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাবলী থেকে এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, হযরত ঈসা (আ.) ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং কিছুকাল ঐ জাতিদেরকে হিতোপদেশ দিতে থাকেন। বৌদ্ধধর্মের কিতাবাদিতে যে তাঁর এসব দেশে আসার কথা লিপিবদ্ধ করা হয় তার সে কারণ নয় যা লাবনে বর্ণনা করেন অর্থাৎ তিনি নাকি গোতম বুদ্ধের শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়ে তা প্রহণ করেছিলেন। ওরূপ বলা এক দৃষ্টান্ত। বরং প্রকৃত সত্য হলো, খোদা তাআলা যখন হযরত ঈসাকে (আ.) কুশের দুর্ঘটনার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন তখন ঐ ঘটনার পর সে

\* পাদটিকা : এক অজ্ঞ মুসলমান তার মন থেকে বানিয়ে বলেছে যে, হয়তো ‘ইয়োয়া আসফ’ দ্বারা সেই আসফের স্ত্রীকে বুঝায় যিনি সোলায়মান (আ.)-এর মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু এ মুর্দ্দ লোকটার এদিকে খেয়াল যায় নি যে, আসফের স্ত্রী নবী ছিল না এবং তাকে ‘শাহজাদা’ বলা যায় না। সে এ-ও চিন্তা করে নি যে, এ দুটোই পুঁজিঙ্গ বাচক শব্দ। স্ত্রীলিঙ্গের জন্য যদি তার এ গুণগুলো থাকেও তবু তাকে ‘নাবিইয়া ও শাহজাদী’ বলা হবে, নবী ও শাহজাদাহ বলা হবে না। এ সোজা সরল লোকটা এ-ও খেয়াল করে নি যে, উনিশ শ” বছরের সময়কাল হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের সাথে মিল থায়। সোলায়মান (আ.) তো তাঁথেকে কয়েক শ” বছর পূর্বে ছিলেন। তাছাড়া, শ্রীনগরে যাঁর কবর রয়েছে সেই নবীকে কেউ কেউ ইয়োয়া আসফ নামে ডাকে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বলে এটা হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর। আমাদের একনিষ্ঠ ভাতা কাশ্মীর নিবাসী মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেব যখন শ্রীনগরে এ মায়ার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন তখন কিছু লোক ইয়োয়া আসফের নাম শুনে বললো, ‘আমাদের মধ্যে এ কবর ঈসা সাহেবের কবর বলে খ্যাত’। সুতরাং অনেক লোক এ সাক্ষ্যই দিল যারা এখনও শ্রীনগরে জীবিত রয়েছেন। যার সন্দেহ থাকে সে নিজে কাশ্মীরে গিয়ে কয়েক লক্ষ মানুষের নিকট জিজেস করে জেনে নিক। এখন, এরপর অস্বীকার নির্লজ্জতা বৈ কিছু নয়। -ঝন্টকার

তারই জামাত, যাদেরকে তিনি পুণ্যের দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য বেছে নিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তার জিহ্বাকে সে মিথ্যা থেকে এবং তার অন্তরকে নাপাক খেয়াল ও অপবিত্র চিন্তা থেকে রক্ষা করে না তাকে এ জামাত থেকে কেটে দেয়া হবে। হে খোদার বান্দাগণ! নিজেদের হৃদয়কে নির্মল কর ও অন্তরকে ধূয়ে ফেল। তোমরা কপটতা ও দ্বৈততা (দু'মুখী স্বভাব)-এর দ্বারা সবাইকে রাজী করতে পার কিন্তু এ স্বভাবের দ্বারা তোমরা খোদার ক্ষেত্রকে উত্তেজিত করবে। নিজেদের প্রাণের প্রতি দয়া কর ও নিজেদের বংশধরকে ধ্বংস হওয়া থেকে বাঁচাও। তোমাদের অন্তরে যদি আল্লাহর চেয়ে

---

দেশে থাকা আর সমীচীন মনে করলেন না এবং যেভাবে কুরায়েশদের যুলুম-অত্যাচারের সময়ে অর্থাৎ যখন তারা আঁ হয়রত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে চেয়েছিল তখন আঁ হয়রত (স.) তাঁর মাত্তুমি থেকে হিজরত করেছিলেন, সেভাবেই হয়রত ঈসা (আ.) ইহুদীদের চরম যুলুমের সময়ে অর্থাৎ যখন তারা তাঁকে হত্যা করতে চায় তখন তিনি হিজরত করেন। আর যেহেতু কিছু সংখ্যক ইহুদী গোত্র (বেবিলন সম্রাট) নবুখদনিংসেরের আক্রমণের ঘটনায় বিক্ষিপ্ত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং কাশ্মীর, তিব্বত ও চীনের দিকে হিজরত করে চলে এসেছিল, তাই হয়রত ঈসা (আ.) এ দেশগুলোর দিকেই হিজরত করে যাওয়াকে সমীচীন মনে করেন। ইতিহাস থেকে এ বিষয়েরও সন্ধান পাওয়া যায় যে, এ সব দেশে কিছু সংখ্যক ইহুদী তাদের আদি রীতি ও পূরান স্বত্বাব অনুযায়ী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। সুতরাং সম্প্রতি যে সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেট পত্রিকায় ২৩ নভেম্বর তারিখে একটি প্রবন্ধ ছেপেছে তাতে একজন ইংরেজ গবেষক এ বিষয়টি স্বীকারও করেছেন এবং একথা মনে নিয়েছেন যে, ইহুদীদের কোন কোন গোত্র এ দেশে (অর্থাৎ ভারতবর্ষে) ও পার্শ্ববর্তী দেশে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেছিল। তিনি সিভিল এন্ড মিলিটারী গ্যাজেটের একই সংখ্যায় আরও লিখেছেন : ‘প্রকৃতপক্ষে আফগানরাও বনী ইসরাইলের অন্তর্ভুক্ত।’ মোট কথা, যখন কিছু সংখ্যক বনীইস্রাইল (ইহুদী) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল, তখন হয়রত ঈসা (আ.)-এর পক্ষে এদেশে এসে বৌদ্ধধর্মের খণ্ডনের দিকে মনোযোগী হওয়া ও এ ধর্মের গুরুদের সাথে সাক্ষাৎ করা আবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং তা-ই ঘটেছিল। সেজন্যই বৌদ্ধধর্মের বই-পুস্তকে হয়রত ঈসা (আ.)-এর জীবনের ঘটনাবলী লিখা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সময়ে এদেশে বৌদ্ধধর্মের অনেক প্রভা-প্রতিপত্তি ছিল এবং বৈদিক ধর্ম নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম বেদকে অঙ্গীকার করতো। মোট কথা, এ যাবতীয় বিষয়কে একক্রিত করলে নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, অবশ্য অবশ্যই হয়রত ঈসা (আ.) এদেশে এসেছিলেন। একথা সুনিশ্চিত ও পাকাপোক্ত যে, \*বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাদিতে এদেশে তাঁর আসার উল্লেখ রয়েছে। আর কাশ্মীরে হয়রত ঈসা (আ.)-এর মায়ার যে প্রায় ১৯০০ বছর ধরে মজুদ আছে বলে বর্ণনা করা হয় তা উল্লেখিত বিষয়ের ব্যক্তিগত অতি উচ্চ স্তরের প্রমাণ বটে। যথাসম্ভব এ মায়ারের সঙ্গে কিছু সংখ্যক ফলক-লিপি ও থাকবে, যা আপাততঃ গোপন রয়েছে। এ যাবতীয় বিষয়ের অধিকতর অনুসন্ধানের জন্য

---

\* পাদটীকা : বৌদ্ধধর্মের কোন কোন বই পুস্তকে ভারতবর্ষে ও তিব্বতে হয়রত ঈসা (আ.)-এর আগমনের উল্লেখ ও আলোচনা রয়েছে; কেবল তাই নয় বরং বিশ্বস্ত সূত্রে ও প্রামাণ্য উপায়ে জানতে পেরেছি যে, কাশ্মীরের পাঞ্জালিপিগুলোতেও তার উল্লেখ ও আলোচনা রয়েছে।

অন্য কেউ অধিক প্রিয় ও সম্মানের পাত্র হয়ে থাকে তা হলে কখনও সম্ভব নয় যে, তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। যদি খোদাকে দুনিয়াতে দেখতে চাও তাহলে তাঁর পথে উৎসর্গীত হয়ে যাও। যদি দুনিয়াতেই খোদাকে দেখতে চাও, তাহলে তাঁর জন্য আত্মবিলীন হও, সর্বতোভাবে তাঁরই হয়ে যাও। কেরামত কী এবং অলৌকিক ঘটনাবলী কখন ঘটে? নিশ্চিত জানবে ও স্মরণ রাখবে, হৃদয়ের পরিবর্তন আকাশের পরিবর্তনকে (অর্থাৎ ঐশ্বী সাহায্য) চায়। যে আগুন (মনস্তাপ) নিষ্ঠার সাথে প্রজ্ঞালিত হয় তা উর্ধ্ব লোককে দেখায়। সকল মুম্বিন যদিও সাধারণভাবে প্রত্যেক বিষয়ে অংশীদার রয়েছে, এমন কি প্রত্যেকে মামুলি ধরনের সাধারণ স্বপ্নও দেখে থাকে এবং কারও প্রতি ইলহামও হয়। কিন্তু সেই কেরামত যাতে খোদার প্রতাপ ও জ্যোতি: বিদ্যমান থাকে এবং যা খোদাকে দেখিয়ে দেয়, তা খোদা তাআলার এক বিশেষ সাহায্যে হয়ে থাকে যা ঐ বান্দাদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য প্রকাশ করা হয় যারা এক অবিভীয় আল্লাহর দরবারে আত্মোৎসর্গের মর্যাদা রাখেন। যখন দুনিয়াতে তাঁদের অপমান ও অবমাননা করা হয়, তাঁদেরকে খারাপ বলা হয়- চরম বিখ্যাবাদী, বানোয়াট ওহী ইলহাম রচনাকারী ও মিথ্যাদাবীদার, পাপাচারী, অভিশপ্ত, দাজ্জাল, ঠক ও প্রতারক বলে তাঁদেরকে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদেরকে ধৰংস করে দেয়ার জন্য চেষ্টা করা হয় তখন তাঁরা এক পর্যায় পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ ও আত্মসংবরণ করেন। অতঃপর

আমাদের জামাত থেকে একটি গবেষণাকারী দল প্রস্তুত হচ্ছে যাদের প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন আমাদের প্রিয়ভাতা মৌলবী হেকীম হাজী হারামায়ন নূরুদ্দীন সন্নামাহ রববুহ। এ দলটি উক্ত বিষয়ে খোঁজ খবর ও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করবেন। এই কর্মতৎপর নিষ্ঠাবানদের কাজ হবে, পালি ভাষার পুষ্টকাবলীও দেখা। কেননা এ-ও জানা গেছে যে, হ্যরত মসীহ (আ.) ঐ অঞ্চলেও তাঁর ‘হারানো মেষগুলোর’ খোঁজে এসেছিলেন। কিন্তু অবশ্যই কাশীরে যাওয়া, তারপর তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের পুষ্টকাবলী থেকে এ যাবতীয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করা এ প্রতিনিধিদলটির অভীষ্ট লক্ষ্য ও কর্তব্য হবে। লাহোর নিবাসী ব্যবসায়ী আমার প্রিয়ভাতা শায়খ রহমতুল্লাহ সাহেব এ সকল ব্যয় নির্বাহের ভার নিজ কাঁদে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু যদি এই সফর পরিকল্পনা অনুযায়ী বেনারস, নেপাল, মাদ্রাজ, সওয়াত, কাশীর ও তিব্বত ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত করা হয়, অর্থাৎ যেখান যেখানে হ্যরত মসীহ (আ.)-এর বসবাস সম্পর্কে সঞ্চান পাওয়া গিয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা এক বড় ধরনের ব্যয় সাপেক্ষ কাজ হবে। আশা করা যায়, যে করেই হোক আল্লাহ তাআলা একে সুসম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারেন, এ হচ্ছে এমন এক প্রমাণ যেদ্বারা স্বীকৃত ধর্মের পাতানো জাল এক নিমিষেই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ে এবং ‘উনিশ শ’ বছরের পরিকল্পনা সহসা নস্যাং হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ও কাশীর ইত্যাদি জায়গায় হ্যরত মসীহ (আ.)-এর আগমন যে একটি বাস্তব ঘটনা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আশ্চর্ষ ও নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ সম্পর্কে একুপ অকাট্য ও জোরালো প্রমাণাদি পাওয়া গিয়েছে যে, এখন তা কোনও বিরক্তবাদীর পরিকল্পনার জোরে গোপন থাকতে পারবে না। প্রতীয়মান হয় যে, এসব অহেতুক ও ভাস্ত ধর্মবিশ্বাসের এ যুগ পর্যন্তই আয়ু ছিল।

খোদা তাআলার আআভিমান যখন তাদের সমর্থনে কোনো নির্দশন দেখাতে চায়, তখন সহসা তাদের হৃদয় ব্যথিত ও ক্ষতবিক্ষত হয়—কেবল তখনই তাঁরা খোদা তাআলার দোরগোড়ায় সকরণ আকৃতি-মিনতির সাথে ঝুঁকে যান। তাঁদের বেদনাভরা দোয়া আসমানে ভীষণ এক আর্তনাদ দৃষ্টি করে। আর যেভাবে তীব্র গরমের পর আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ দেখা দেয়, তারপর তা একত্র হয়ে স্তরে স্তরে জমাট এক মেঘপুঁজি পরিণত হয় ও সহসা বর্ষিত হতে শুরু করে। তেমনিভাবে নিষ্ঠাবানদের যথাসময়ের বেদনা-ভরা আকৃতি-মিনতি মেঘপুঁজি হয়ে উঠিত হয়। আর পরিশেষে এক নির্দশনের আকারে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। মোট কথা, যখন কোন সত্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান ওলী-আল্লাহর ওপর কোন যুলুম অত্যাচার চরম সীমায় পৌছে যায় তখন বুঝা উচিত এখন কোন নির্দশন প্রকাশিত হবে। ‘হ’র বালা কি কওয় রা হক দাদাহু আস্ত/যেরে আঁ গঞ্জে করম বানেহাদাহু আস্ত।

আমাদের প্রভু ও নেতা হয়রত খাতামুল আমিয়া সল্লাল্লাহু আল্লাহহে ওয়া সাল্লাম যে বলে গিয়েছেন, আগামনকারী প্রতিশ্রূত মসীহ কুশ ভঙ্গ করবে ও সর্গীয় অন্ত্রের সাহায্যে দাঙ্গালকে বধ করবে— এ হাদীসের অর্থ এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই মসীহ মাওউদের সময়ে জমিন ও আসমানের খোদা নিজ পক্ষ থেকে বহু একুশ বিষয় ও উপকরণের উন্নত ঘটাবেন যদ্বারা ত্রিভুবন ও প্রায়চিত্তবাদের ক্রুশীয় আকীদা-বিশ্বাস আপনা-আপনি উৎপাদ হয়ে যাবে। মসীহর আকাশ থেকে নাযেল (অবতীর্ণ) হওয়াও এ অর্থেই ছিল যে, তখন আসমানের খোদার ইচ্ছায় ক্রুশভঙ্গের জন্য জাজ্জল্যমান সাক্ষ্য-প্রমাণ সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং তদ্দপ্ত ঘটেছে। এটা কে জানতো যে, দৈসা (আ.) এর জন্য ব্যবহৃত মলম সংক্রান্ত বিবরণ যা (ইউনানী) চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রস্তাদিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তা বেরিয়ে আসবে? আর এটা কে-ই বা জানতো যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন পুস্তকাদি থেকে এ প্রমাণ বেরিয়ে আসবে যে, হয়রত দৈসা (আ.) সিরিয়া-ফেলেভিনের ইহুদীদের প্রতি নিরাশ হয়ে ভারতবর্ষ, কাশীর ও তিব্বতের দিকে গিয়েছিলেন? সাম্প্রতিককালে মুসলমানদের প্রগতি প্রাচীন প্রস্তাদিও হস্তগত হয়েছে যেগুলোতে স্পষ্ট এ বর্ণনা মজুদ রয়েছে যে, ইয়োয় আসফ একজন নবী ছিলেন যিনি অন্য কোনো দেশ থেকে এসেছিলেন এবং কাশীরে ইন্তেকাল করেন। আর এ-ও বর্ণনা করা হয় যে, এ নবী আমাদের নবী করীম (সা.)-এর ছয় শঁ বছর পূর্বে গত হয়েছেন। একথাও কে-বা জানতো যে, হয়রত দৈসা (আ.)-এর কাশীরে কবর রয়েছে? মানুষের কি সাধ্য ছিল যে, এ যাবতীয় বিষয় নিজ ক্ষমতার জোরে সৃষ্টি করে দিতে পারতো? এখন এ সকল ঘটনা এমনভাবে শ্রীষ্টধর্মকে যিটিয়ে দেয় যেভাবে দিনের উদয় হলে রাত মিটে যায়। এ ঘটনা সপ্রমাণ হওয়ার দরুণ শ্রীষ্টধর্মকে সে আবাত লাগে যা এই ছাদে লাগতে পারে যার সমস্ত ভার একটি কড়ি-কাঠের ওপর ছিল, তারপর কড়ি-কাঠ ভেঙ্গে যাওয়ায় ছাদ ধ্বসে পড়লো। অনুরূপ, এ ঘটনার প্রমাণ হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে শ্রীষ্টধর্মের অবসান অবধারিত। খোদা যা চান, করেন। এ সকল কুদুরতের দ্বারাই তাঁকে জানা ও চেনা যায়। দেখ, এ আয়াতের কত উত্তম অর্থ সাব্যস্ত হয়: ওয়ামা কাতালুহু ওয়া মা সালালুহ (সুরা নিসা: ১৫৮) অর্থাৎ মসীহকে হত্যা করা বা কুশে দিয়ে মেরে ফেলা সবই মিথ্যা। প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে, এ লোকদের ধোঁকা লেগেছে, মসীহ খোদা তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী কুশ থেকে রক্ষা পেয়ে

আফসোসের সাথে আমাকে এখানে একথা লিখতে হচ্ছে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা অন্যায়-অবিচার, মিথ্যা ও বক্রতার আশ্রয় নিতে বিরত হয় না। তারা খোদা তাআলার কথাকে বড়ই দুঃসাহসী হয়ে মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে ও মহা প্রতাপশালী খোদার নির্দর্শনাবলীকে মিথ্যা ঘোষণা করে। আমি আশা করেছিলাম যে, শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালভী, মুহাম্মদ বখশ জা'ফর জাটলি ও আবুল হাসান তিবতিকে উদ্দেশ্য করে ২১ নভেম্বর, ১৮৯৮ইং তারিখে যে বিজ্ঞপ্তি লিখা হয়েছিল তার পরে এ লোকগুলো নীরবতা অবলম্বন করবে, কেননা বিজ্ঞপ্তিতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল যে, ১৫ জানুয়ারি ১৯০০ইং পর্যন্ত এ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হবে তাকে আল্লাহ্ তাআলা লাঙ্গিত করবেন। বস্তুত এটা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীকে

---

বেরিয়ে যান। ইঞ্জিলে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয় তাহলে ইঞ্জিল এ সাক্ষ্যই দেয়। সারা রাত মসীহৰ সকাতর ও বেদনাথাক দোয়া কি রদ হতে পারতো? মসীহৰ এ কথা বলা যে, ইউনুসের ন্যায় তিন দিন পর্যন্ত কবরে থাকবে— এর কি এ অর্থ হতে পারে যে, সে মৃতাবস্থায় কবরে থাকলো? ইউনুস কি মাছের পেটে তিন দিন মৃতাবস্থায় থেকেছিলেন? পিলাতের ত্রীর স্বপ্নের দ্বারা কি খোদার এ উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় না যে, মসীহকে মেন ত্রুশের মৃত্যু থেকে রক্ষা করে? তেমনিভাবে, শুক্রবার শেষ বেলায় মসীহকে ত্রুশে দেয়া ও সন্ধ্যার পূর্বেই নামিয়ে ফেলা এবং পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তিন দিন পর্যন্ত তাকে ত্রুশে ঝুলিয়ে না রাখা, তার হাড়গোড় না ভাস্তা ও (তার দেহ থেকে) রক্ত বের হওয়া এ যাবতীয় বিষয় কি উচ্চস্বরে বলছে না, এসব উপায়-উপকরণ মসীহৰ প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল? বস্তুত দোয়া করার সাথে সাথে রহমতের এ সকল উপকরণ বাস্তব রূপ ধারণ করে। আল্লাহ্ দরবারে গৃহীত বাস্তব সারা রাত কেঁদে কেঁদে করা দোয়াও কি কখনও রদ হতে পারতো? তারপর, ত্রুশের ঘটনার পর হাওয়ারী (শিষ্য)-দের সাথে মসীহৰ দেখা করা ও তার দেহের ক্ষতগুলো দেখানো এ কথার স্পষ্টকে কতো শক্তিশালী প্রমাণ যে, তিনি ত্রুশে বিন্দ হয়ে মরেন নি! যদি তা সত্য না হয়ে থাকে তাহলে মসীহকে ডাকো তো দেখি তিনি মেন এসে তোমাদের সাথে দেখা করেন, যেমন তিনি হাওয়ারীদের সাথে দেখা করেছিলেন! মোট কথা, সকল দিক দিয়ে প্রমাণিত যে, ত্রুশীয় মৃত্যু থেকে মসীহৰ প্রাণ রক্ষা করা হয় এবং তিনি ভারত বর্ষে আসেন। কেননা বনী ইসরাইলের দশটি গোত্র এসব দেশেই চলে এসেছিল যারা পরিশেষে মুসলমান হয়ে যায়। তারপর ইসলাম প্রহণের পর তওরাতের ওয়াদা অনুযায়ী তাদের মধ্যে কয়েকজন বাদশাহও হয়েছেন। এটা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়াহে ওয়া সাল্লামের নবুওয়তের সত্যতার স্পষ্টকে এক দলিল বিশেষ। কেননা তওরাতে ওয়াদা ছিল, বনী ইসরাইল প্রতিশ্রুত নবীর অনুসারী হয়ে ক্ষমতা ও রাজত্ব পাবে। মোট কথা, মসীহ ইবনে মরিয়মকে ত্রুশীয় মৃত্যুতে মেরে ফেলা এ এমন এক ভিত্তি ছিল, যার ওপরে খ্রীষ্টধর্মের যাবতীয় মূলনীতি প্রায়চিত্তবাদ ও ত্রিভুবন ইত্যাদির ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল। আর এটাই সে ধরণ যা খ্রীষ্টানদের (তৎকালীন অনুবাদক) চল্লিশ কোটি মানুষের হৃদয়ে ঢেকে গেছে। এটা ভাস্ত প্রমাণিত হলে খ্রীষ্টধর্মের কোন ভিত্তিই থাকে না। যদি

নির্ধারণের সুস্পষ্ট মানদণ্ড স্বরূপ ছিল যা খোদা তাআলা তাঁর ইলহামের মাধ্যমে কায়েম করেছেন। এ লোকদের উচিত ছিল উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবার পর চুপ থাকতো এবং ১৫ জানুয়ারি, ১৯০০ তারিখ পর্যন্ত খোদা তাআলার সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতো। কিন্তু আফসোস, তারা তা করেনি। বরং উল্লেখিত জাটলি ৩০ নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে প্রকাশিত তার বিজ্ঞাপনকে আবারও ঐ সব নোংরামিতে ভরে দিয়েছে যা তার নিত্যকার রীতি এবং তাতে সে আদ্যোপাত্ত শুধু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। সে ঐ বিজ্ঞাপনে লিখেছে যে, এ ব্যক্তির অর্থাৎ এ অধমের কোনও ভবিষ্যদ্বাণী নাকি পূর্ণ হয় নি। এর উভরে আমরা এছাড়া আর কী-ই-বা বলতে পারি: ‘লানাতুল্লাহে আলাল কাষেবীন’ (মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর লানাত বর্ষিত হোক)। সে এ-ও বলে যে, আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। আমরা এর উভরেও ‘লানাতুল্লাহে আলাল কাষেবীন’ ছাড়া কিছু বলতে পারি না। আসলে যখন মানুষের অন্তর কার্পণ্য ও বিদ্বেষের দরকুন অঙ্গ হয়ে যায় তখন সে দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। তার হৃদয়ের ওপর খোদার ঘোহর লেগে যায়। তার কানের ওপরে পর্দা পড়ে যায়। একথা এ যাবৎ কার নিকটই-বা গোপন আছে যে, আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী শর্ত্যুক্ত ছিল এবং খোদার ইলহামে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সে সত্যের দিকে ঝুঁকে যাওয়ার অবস্থায় নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর মৃত্যু থেকে বেঁচে যাবে! অতঃপর আথম তার কার্য কলাপ দ্বারা, তার কথা বার্তার দ্বারা, তার ভয়ে কাতর হয়ে পড়ার অবস্থার দ্বারা, তার কসম না যাওয়ার দ্বারা এবং সরকারের নিকট নালিশ না করার দ্বারা প্রমাণ করে দিয়েছিল

শ্রীষ্টানদের মধ্যে কোন সম্পদায় ধর্মীয় অনুসন্ধানের উদ্দীপনা পোষণ করে তাহলে উল্লেখিত প্রমাণগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার দরকুন তারা শীঘ্রই শ্রীষ্টধর্মকে বিদায় সন্তানণ জানাবে। আর যদি এ অনুসন্ধানের আগুন ইউরোপের সমস্ত হৃদয়ে জুলে উঠে তাহলে চলিশ কোটি মানুষের যে জনগোষ্ঠী ‘উনিশশ’ বছরে তৈরী হয়েছে তা থাথাসম্ভব উনিশ মাসের ভেতর অদ্য হাতের ছোঁয়ায় সহসা পাল্টা থেয়ে মুসলমান হয়ে যেতে পারে। কেননা ত্রুশীয় মৃত্যুর আকীদা-বিশ্বাসের পর এটা প্রমাণ হয়ে যাওয়া যে, মসীহ ত্রুশে মারা যান নি বরং অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করতে থাকেন এটা এক বিষয় যা নিমিষেই শ্রীষ্টায় আকীদা-বিশ্বাসকে অন্তর থেকে উধাও করে দেয় ও শ্রীষ্টান জগতে মহা বিপুব ঘটায়। হে প্রিয়গণ! এখন শ্রীষ্টধর্মকে ছেড়ে দাও, কেননা খোদা প্রকৃত সত্যকে দেখিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের আলোর মধ্যে আস, যাতে নাজাত ও পরিত্রাণ লাভ করতে পার। সর্বজ্ঞ খোদা জানেন, এ সকল উপদেশ নেক ও পরিত্র নিয়য়তে পরিপূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের পর প্রদান করা হচ্ছে।

যে, ভবিষ্যদ্বাণীর (নির্ধারিত) দিনগুলোতে তার অন্তর খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসে কায়েম থাকে নি। ইসলামের মাহাত্ম্য ও আয়মত তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপ হওয়া অসম্ভবের কিছু ছিল না, কেননা সে মুসলমানেরই সন্তান ছিল। কোন কোন স্বার্থের জন্য সে ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মূর্ত্তাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছিল। ইসলামী আদর্শের ছোঁয়া ও এর স্বাদ তার অন্তরে নিহিত ছিল, সেজন্যই খ্রীষ্টানদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সে পুরোপুরি একমত ছিল না। আর আমার সম্পর্কে সূচনালগ্ন থেকেই সুধারণা পোষণ করতো। অতএব ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে তার ভীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও বোধগম্য ছিল। তারপর যখন সে কসম খেয়ে নিজেকে খ্রীষ্টান বলে প্রমাণ করলো না, খ্রীষ্ট-ধর্মে তার বিশ্বাসী হওয়াও সে প্রমাণ করলো না এবং (সরকারের নিকট) নালিশও করলো না, বরং চোরের ন্যায় ভয় করতে থাকলো আর খ্রীষ্টানদের শক্তভাবে চাপ দেয়া সত্ত্বেও উল্লেখিত কাজগুলোর জন্য যখন সে সম্মত হলো না তখন তার ভূমিকা কি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে স্পষ্টতঃ সাক্ষ্য দিচ্ছে না যে, ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্যের প্রভাবে নিশ্চয় সে ভয় পেতে থাকে? উদাসীন জীবন-যাপনকারী লোকেরা তো জ্যোতির্বিদের ভবিষ্যদ্বাণীর দরশনও ভয় পেয়ে যায়। অতএব ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর কী তুলনা হতে পারে যা অত্যন্ত জোরালোভাবে করা হয়েছিল, যা শুনা মাত্র তখনই তার চেহারা ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল! সেই সাথে এই ওয়াদা করা হয়েছিল যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ না হলে আমাকে যেন শাস্তি দেয়া হয়। অতএব এর প্রতাপ কী করে এমন লোকের হৃদয়কে প্রভাবিত করতো না, যা সত্যতার আলো থেকে বাঞ্ছিত? অতঃপর এ ব্যাপারটি কেবল অনুমানস্বরূপই ছিল না, বরং তার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ার অবস্থাকে শত শত লোকে দেখেছিল এবং আথম নিজে তার অভ্যন্তরীণ অস্ত্রিতা ও আকীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তনকেও প্রকাশ করে দিল। অতঃপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পর কসম না খাওয়ার এবং নালিশ না করার মাধ্যমে সে তার মানসিক পরিবর্তনের অবস্থাকে আরও সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত পর্যায়ে পৌঁছে দিল। তারপর খোদার ইলহাম অনুযায়ী সে আমার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে মারাও গেল। অতএব এ যাবতীয় ঘটনা কি প্রত্যেক ন্যায়পরায়ণ ও খোদা-ভীরু ব্যক্তির হৃদয়কে এ দৃঢ়-বিশ্বাসে ভরে দেয় না যে, আথম ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদকালে ইলহামী শর্তকে কাজে লাগিয়ে জীবিত থাকে? তারপর ঘোষণাকৃত খ্রীষ্টবাণীর সংবাদ অনুযায়ী সত্যের স্বাক্ষ্যকে গোপন রাখার দরং মারা যায়।

দেখ, তালাশ কর সে এখন কোথায়! এ কি সত্য নয় যে, সে কয়েক বছর পূর্বে  
মারা গেছে কিন্তু যার অর্থাৎ এই অধমের সাথে মৃত্যুরে ড. মার্টিন ক্লার্কের  
বাসভবনে বিতর্ক করেছিল সে এখনও জীবিত যে প্রবন্ধটি লিখছে? যে যারা লাজ-  
শরমের ধার ধারো না! একটু চিন্তা করে দেখ, সাক্ষ্যকে গোপন করার পরে সে  
কেন শীত্র মরে গেল।

আমি তো তার জীবদ্ধায় এ-ও লিখে দিয়েছিলাম যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী  
হই তাহলে আমি প্রথমে মারা যাব। নচেৎ আমি আথমের মৃত্যুকে দেখবো।  
অতএব যদি তোমাদের লজ্জা-শরমে থাকে তাহলে আথমকে খোঁজ, সে কোথায়!  
সে প্রায় আমার সমবয়সী ছিল এবং ত্রিশ বছর কাল ধরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ-  
পরিচয় রাখতো। যদি আল্লাহ চাইতেন আরও ত্রিশ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে  
পারতো। অতএব কী কারণে সে ঐ সময়েই যখন সে খীঁষ্টানদের মনস্তষ্টির জন্য  
ইলহামী (ঐশ্বী) ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা এবং সত্যের দিকে মানসিকভাবে তার  
বুঁকে যাওয়াকে লুকালো, তখন খোদার ইলহাম (ঐশ্বীবাণী) অনুযায়ী সে মরে  
গেলো? খোদা তাআলা ঐ সকল মানবহন্দয়ের ওপর অভিসম্পাত করেন যারা  
সত্যকে বুঝার ও পাওয়ার পরও তা অস্বীকার করে। আর যেহেতু এই অস্বীকার,  
যা অধিকাংশ খীঁষ্টান এবং কিছু সংখ্যক অসদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত মুসলমানেরা করেছে  
তা খোদা তাআলার দৃষ্টিতে প্রকাশ যুলুম ছিল, সেহেতু তিনি অপর একটি মহান  
ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্বা করে দেখাবার মাধ্যমে অর্থাৎ পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর  
ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দ্বারা অস্বীকারকারীদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে  
দেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি এমন পর্যায়ের অলৌকিকতাপূর্ণ ছিল যে, এতে সময়ের  
পূর্বেই অর্থাৎ পাঁচ বছর পূর্বে বলে দেয়া হয়েছিল যে, লেখরাম কোন্ দিন ও  
কীভাবে মারা যাবে। কিন্তু আফসোস! সংকীর্ণমনা লোকেরা যাদের মৃত্যুর কথা  
স্মরণ নেই, তারা এ ভবিষ্যদ্বাণীটিকেও গ্রহণ করে নি। খোদা তাআলা আরো বহু  
সংখ্যক নির্দশন দেখিয়েছেন, কিন্তু তা সবই এরা অস্বীকার করে। এখন ২১  
নভেম্বর, ১৮৯৮ বিজ্ঞপ্তি হচ্ছে এক চূড়ান্ত ফয়সালা। প্রত্যেক সত্যাষ্঵ীর  
উচিত, ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করা। খোদা তাআলা মিথ্যাবাদী এবং কায়াব ও  
দাজ্জালদেরকে সাহায্য করেন না। কুরআন করীমে সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে  
যে, খোদা তাআলা মু'মিনদেরকে ও রসূলদেরকে জয়যুক্ত করেন। এটা তাঁর  
অঙ্গীকার। এখন এ ব্যাপারটি নিষ্পত্তির জন্য আসমানে রয়েছে। পৃথিবীর বুকে

চিল্লালে কিছু হবে না। উভয় পক্ষ (বা দল) তাঁর দৃষ্টির সামনে রয়েছে। অচিরেই সুস্পষ্টতঃ প্রকাশ পাবে, তার সাহায্য ও সমর্থন কার জন্য অবতীর্ণ হয়। ‘ওয়া আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহে রবিল আলামীন, ওয়াসসালামু আলা মানিস্তাবাআল হৃদা’ (-আমাদের শেষ ঘোষণা এই যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। এবং হেদায়াতকে যে অনুসরণ করে তার জন্য শান্তি)।

ঘোষণাকারী-

মির্বা গোলাম আহমদ  
কাদিয়ান, ৩০ নভেম্বর, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ

**কাশীরের অধিবাসী মৌলবী আব্দুল্লাহ সাহেবের চিঠি**

[সর্বসাধারণের উপকারার্থে হ্যৱত ঈসা (আ.)-এর মায়াৱের নকশাসহ পত্ৰটি এখানে প্ৰকাশ কৰা গেল]

ذلت صادقِ محوالے بے تمیز ہے۔ نیل ہے ہرگز نخواہی شد عزیز

বিনীত বান্দা আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে ব-খিদমত ভৃত্যর আকদস মসীহ মাওউদ,  
আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ ।

হয়রত আকদস! এ অধম আপনার আদেশ মোতাবেক শ্রীনগরে ঘটনাস্থলে  
অর্থাৎ শাহ্যাদাহ ইউয় আসফ (আ.)-এর মায়ার শরীফে পৌছে যথাসম্ভব  
সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে তথ্যানুসন্ধান করেছি, বয়স্ক ও বয়ঃবৃন্দ বুর্যুর্গদের কাছেও  
জিজ্ঞাসাবাদ করেছি এবং খাদিমদের ও আশ-পাশের লোকদের কাছেও প্রত্যেক  
আঙ্গিকে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি। হ্যুম্র আকদস! অনুসন্ধানে আমি জানতে  
পেরেছি যে, এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নবী ইউয় আসফের (আ.) মায়ার এবং  
মুসলমানদের মহল্লায় অবস্থিত। কোন হিন্দুর এখানে বসতি নেই, আর এ  
জায়গায় হিন্দুদের কোন সমাধি নেই। বিশ্বস্ত লোকদের সাক্ষ্যের দ্বারা এ-ও  
প্রমাণিত হয়েছে যে, উনিশ শ' বছর ধরে এ মাজারটি রয়েছে এবং মুসলমানরা  
একে অত্যন্ত সম্মান ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখে ও এর যিয়ারত করে থাকে।  
সর্বসাধারণের বিশ্বাস, এ মায়ারটিতে একজন মহান পর্যাগম্বর (নবী) সমাহিত  
আছেন যিনি কাশ্মীরে অন্য কোনো দেশ থেকে মানুষকে উপদেশ বাণী শুনাবার  
জন্য এসেছিলেন এবং বলা হয় এ নবী আমাদের নবী করীম (স.)-এর ছয়শ'  
বছর পূর্বে গত হয়েছেন। তবে এ বিষয়টি এখনও উদ্ঘাটিত হয় নি যে, এ দেশে  
তিনি কেন\* এসেছিলেন। কিন্তু এ সকল ঘটনা ও তথ্যাদি অবশ্যই সুপ্রমাণিত  
এবং এ বুর্যুর্গ যার নাম কাশ্মীরের মুসলমানরা ইউয় আসফ দিয়েছে তিনি যে  
একজন নবী এবং শাহ্যাদাহ তা বিপুল সাক্ষ্য-সাবুদের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিশ্বাসের

\* **টীকা :** সেই নবী যিনি আমাদের নবী করীম (স.)-এর ছয়শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন হ্যরত ঈসা (আ.), অন্য কেউ নয়। ইউসু সুন্না (হিন্দু ভাষায় হ্যরত ঈসার নাম) শব্দটির আকৃতি বদলে গিয়ে ‘ইউষ’ হয়ে যাওয়া অতি সহজেই বুবা যায়। কেননা ‘ইউসু’ শব্দটিকে ইংরেজী ভাষায়ও ‘জেয়াস’ (Jesus) বানিয়েছে তখন ‘ইউষ আসফ’ নামটিতে জেয়াস-এর চেয়ে খুব বেশি একটা পরিবর্তন হয়নি। এ শব্দটির সংস্কৃত ভাষার সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এটি সুস্পষ্টভৎ হিন্দু বলেই প্রতীয়মান হয়। হ্যরত ঈসা (আ.) এদেশে কেন এসেছিলেন তার কারণও সুস্পষ্ট। তা এই যে, সিরিয়ার ইহুদীয়া তাঁর তরলীগকে যখন হাহণ করলো না এবং তাঁকে তুশে বিন্দ করে হত্যা করতে চাইলো তখন খোদা তাআলা তার ওয়াদা

স্তরে উপনীত। এদেশে হিন্দুদের কোনও উপাধিতে তিনি খ্যাত নন, যেমন রাজা বা অবতার, ঝষি, মুনি বা সিদ্ধ ইত্যাদি। বরং সর্বসম্মতভাবে সবাই তাকে নবী বলেন। নবী শব্দটি মুসলমান ও ইসরাইলীদের মধ্যে এক ও অভিন্ন একটি শব্দ। আর যে ক্ষেত্রে কোন নবী আমাদের নবী করীম (স.)-এর পরে আসেন নি, আসতে পারতেনও না, সেজন্য কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমান সর্বসম্মতভাবে এটাই বলে, এ নবী ইসলামের পূর্বের কোন নবী। তবে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছুতে

---

অনুযায়ী, আর তেমনি হ্যরত ঈসার দোয়া কবুল করে তাকে ত্রুশে বিন্দ হয়ে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। অতঃপর ইঞ্জিলে যেমন লিখা আছে যে, হ্যরত ঈসার (আ.) ইচ্ছা ছিল তিনি ঐ ইহুদীদেরকেও বাণী পৌছাবেন যারা নবুখদনিস্বরের ঘটানো বিপর্যয়ের সময়ে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় চলে এসেছিল। অতএব এই উদ্দেশ্য সফলের জন্যই তিনি এ দেশে এসেছিলেন। ফ্রঞ্চ গবেষক ড. বার্নিয়ের (Dr. Bernier) তার প্রণীত *Travels* (সফর বৃত্তান্ত) গ্রন্থে লিখেছেন, ‘বহু ইংরেজ গবেষক অতি জোরালোভাবে এ রায় প্রকাশ করেছেন যে, কাশ্মীরের মুসলমান অধিবাসীরা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বনী ইস্রাইল, যারা বিপর্যয়ের সময়ে এ দেশে এসেছিল। তাদের অবয়ব, চেহারার আকৃতি, পোষাক-আশাক, লস্বা কূর্তা এবং কোন কোন প্রথা ও সৌভাগ্য নীতি এর সাক্ষ্য দেয়।’ অতএব অতি সহজেই ধারণা করা যায়, হ্যরত ঈসা (আ.) সিরিয়ার ইহুদীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়ে এদেশে তাঁর জাতির লোকদের নিকট তবলীগ পৌছাবার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। সম্প্রতি যে রুশ পর্যটক একখানা ইঞ্জিল আবিষ্কার করেছেন (যুঁজে পেয়েছেন) যা আমি লভন থেকে আনিয়েছি, সেটিও এ রায়ে আমাদের সাথে একমত যে, নিচয় হ্যরত ঈসা (আ.) এ দেশে এসেছিলেন। আর কোন কোন গ্রন্থকার ইউয় আসফ নবীর যে জীবন-বৃত্তান্ত ও ঘটনাবলী লিখেছেন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও যেগুলোর অনুবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলো পান্ত্রী সাহেবানও পাঠ করে অত্যন্ত হতবাক হচ্ছেন। কেননা (এতে বর্ণিত) ঐ শিক্ষাগুলোর ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষার সাথে অনেক মিল রয়েছে, বরং বেশির ভাগ বাক্যই কাকতালীয় ব্যাপার মনে হয়। তেমনিভাবে তিব্বতীয় সুসমাচারের প্রচলিত ইঞ্জিলের সাথে অনেক কাকতালীয় মিল রয়েছে। অতএব এ সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ এমন নয় যে কোন ব্যক্তি শক্তা মূলক জোর খাটিয়ে নিমিষে উড়িয়ে দিতে পারে। বরং এগুলোতে সত্যতার আলো সুস্পষ্ট দেখা যায়। এগুলো এমন তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতবহু সাক্ষ্য প্রমাণ, যা এক সাথে একত্রে দেখায় এ সিদ্ধান্তে পৌছে দেয় যে, এ কোন ভিত্তিহীন গাল-গল্ল নয়। ইউয় আসফ নামটি হিকু ভাষার সাথে যিল থাকা এবং ইউয় আসফ নামটির নবী বলে ধূসিদ্ধি লাভ করা যা এমন একটি শব্দ যা কেবল ইসরাইলী ও ইসলামী নবীদের জন্যই বলা হয়, তারপর ঐ নবীর সাথে শাহীয়াদাহু শব্দটির যোগ হওয়া অতঃপর এ নবীর গুণাবলী হ্যরত ঈসা (আ.)-এর সাথে অবিকল সামঝস্যপূর্ণ হওয়া, তার শিক্ষা ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষার অবিকল অনুরূপ হওয়া, তদুপরি মুসলমানদের মহল্লায় তার সমাহিত হওয়া, এ মায়ারের সময়কাল উনিশ শ' বছর বলে বর্ণিত হওয়া, অতঃপর এ যুগে একজন ইংরেজ কর্তৃকও একটি ইঞ্জিলের ভাষ্যের সন্ধান পাওয়া এবং এই ইঞ্জিল থেকে সুস্পষ্টিত প্রমাণিত হওয়া যে, হ্যরত ঈসা (আ.) এ দেশে আসেন— এ যাবতীয় বিষয়ের দিকে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে নিশ্চয় এ সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, নিঃসন্দেহে হ্যরত ঈসা (আ.) এ দেশে (ভারতবর্ষে) এসেছিলেন এবং এখানেই (কাশ্মীরে) ইন্তেকাল করেন। এছাড়াও অনেকগুলো যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে যা আমি আলাদা এক পুস্তকে লিখবো- (গ্রন্থকার)

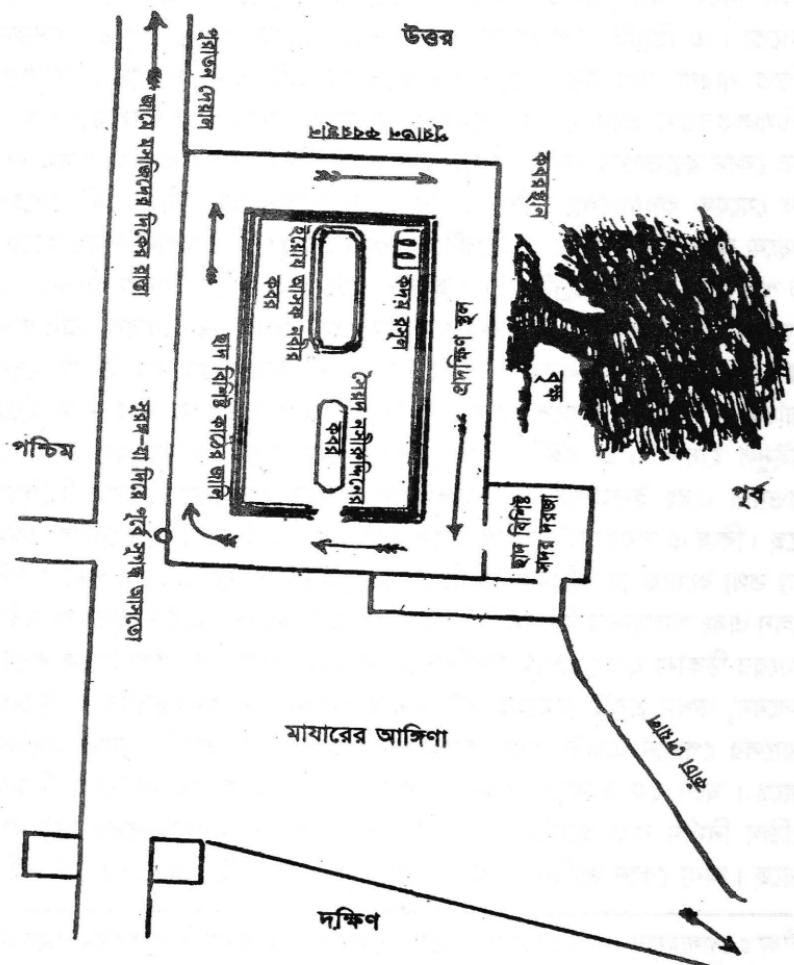
পারেন নি যে, তিনি একজন ইসরাইলী নবী। নবী শব্দটি যেহেতু কেবল দু'টি জাতি অর্থাৎ মুসলমান ও বনী ইসরাইলের নবীদের জন্যই অভিন্নরূপে প্রচলিত আর ইসলামে আঁ হ্যারত (স.) এর পর কোন নবী আসতে পারেন না, সেহেতু আবশ্যিকীয়ভাবে তিনি হলেন ইসরাইলী নবী- এটাই সুনির্দিষ্ট হলো। কেননা তৃতীয় কোন ভাষায় এ শব্দটির ব্যবহার নেই। নিঃসন্দেহে কেবল দু'টি ভাষায় এবং দু'টি জাতির মধ্যেই এর অভিন্নতা সীমাবদ্ধ।\* কিন্তু খতমে নবুওয়াতের কারণে মুসলমান জাতি এখেকে বেরিয়ে গেল। অতএব স্পষ্টত চূড়ান্ত কথা এই দাঁড়ালো যে, তিনি একজন ইস্রাইলী নবী। অতঃপর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রমাণিত হয়ে যাওয়া যে এ নবী আমাদের নবী করীম (স.)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন তা প্রথমোক্ত যুক্তি-প্রমাণকে সন্দেহাতীত বিশ্বাসে পৌছে দেয় এবং প্রত্যেক সচেতন মানুষকে এ সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় যে, এ নবী হচ্ছেন হ্যারত মসীহ ঈসা (আ.), অন্য কেউ নয়। কেননা তিনিই সেই ইসরাইলী নবী যিনি আঁ হ্যারত (স.)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে গত হয়েছেন। তারপর তিনি শাহ্যাদাহ নামেও অভিহিত হয়েছেন বহুল বর্ণিত ঐতিহাসিক এ তথ্যটিতে নজর দিলে উল্লিখিত যুক্তি-প্রমাণ আলোর ওপরে আলো পড়ার ন্যায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কেননা এ সময়কালটিতে হ্যারত ঈসা (আ.) ছাড়া অন্য কোন নবী কখনও শাহ্যাদাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। তারপর ইউয় আসফ নামিটর যে 'ইউসু' (يُسُوٰ ) শব্দের সাথে অনেক মিল রয়েছে তা এ যাবতীয় সুনিশ্চিত বিষয়কে আরও জোরালো করে। তারপর ঘটনাস্থলে পৌছেলে আরেকটি প্রমাণের খোজ পাওয়া গেল, সংযুক্ত নকশাটি থেকে যেমন প্রকাশ পাচ্ছে। তা হলো, এ নবীর মায়ারাটি উভর দক্ষিণে অবস্থিত এবং জানা যায় যে, উভর দিকে রয়েছে মাথা এবং পা দক্ষিণ দিকে। আর এ দাফন পদ্ধতিটি কেবল মুসলমানও আহ্লে কিতাবের সাথেই নির্দিষ্ট। আরেকটি আনুষঙ্গিক প্রমাণ (Side evidence) হচ্ছে এ কবরস্থানের সংলগ্ন অঞ্চল কিছু দূরে একটি পাহাড় 'কোহে সোলেমান' নামে প্রসিদ্ধ। এ নাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ইসরাইলী নবী এ জায়গায়

\*টীকা : অর্থাৎ নবী শব্দটি কেবল দুটি ভাষার সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। অর্থাৎ এক, হিকু ভাষায় নবী শব্দটি প্রচলিত। বিতীয়ত: আরবী ভাষায়। এছাড়া সারা জগতের ভাষাগুলো নবী শব্দটির সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। অতএব এ শব্দটি যে ইউয় আসফের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে তা পরিচিতি-ফলকের ন্যায় সাক্ষ্য দেয় যে, এ ব্যক্তি হয়তো ইসরাইলী নবী, নয়তো ইসলামী নবী। কিন্তু খতমে নবুওয়াতের পর অন্য কোন নবী আসতে পারে না। অতএব সুনির্দিষ্টভাবে সাব্যস্ত হলো যে, ইউয় আসফ ছিলেন ইসরাইলী নবী। আর তাঁর যে সময়কাল বলা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতে অকাট্যভাবে সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তিনিই হ্যারত ঈসা (আ.)। তাঁকেই শাহ্যাদাহ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। -গ্রন্থকার

এসেছিলেন\*। এ শাহ্যাদাহ নবীকে হিন্দু সাব্যস্ত করা নিতান্তই অজ্ঞতা। এটা এমন একটা ভুল যা এ সকল সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণকে সামনে রেখে তা খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত ভাষায় কোথাও নবী শব্দটির ব্যবহার নেই। বরং এ শব্দটি হিন্দু ও আরবী ভাষার সাথে নির্দিষ্ট এবং দাফন করা হিন্দুদের রীতি নয়। হিন্দুরা তো তাদের মৃতদেরকে পোড়ায়। অতএব কবরের আকার আকৃতি ও অকাট্যভাবে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, এটা বনী ইস্রাইলী। কবরটির পাশেই পশ্চিম দিকে ছিদ্র রয়েছে। মানুষে বলে, এ ছিদ্র দিয়ে অতি উত্তম সুগন্ধ আসতো। এ ছিদ্রটি বেশ প্রশংস্ত এবং কবরের ভেতর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেজন্য নিশ্চিত ধারণা করা হয়, কোন বড় উদ্দেশ্যে এটি রাখা হয়েছে। যথাসম্ভব স্থূতিফলকস্বরূপ এতে কোন জিনিস পুঁতে রাখা হয়েছে। জনসাধারণের মতে এতে কোন রন্ধনাভাব আছে। কিন্তু এ ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তবে যেহেতু কবরগুলোতে ছিদ্র রাখার কোন দেশের রীতি নীতি নেই সেহেতু এখনকে মনে করা হয় যে, এ ছিদ্রটিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ ও মহান রহস্য আছে। শত শত বছর ধরে এ ছিদ্রটির চলে আসা— এটা আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এ শহরের শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরাও বলেন, এটি কোন নবীর কবর, যিনি অন্য কোন দেশ থেকে পর্যটকরূপে এসেছিলেন এবং তাঁকে শাহ্যাদাহ উপাধি দেয়া হয়েছিল। শিয়ারা আমাকে একটি কিতাবও দেখিয়েছিলেন যার নাম হচ্ছে ‘আইনুল হায়াত’। এ বইটিতে ১১৯ পৃষ্ঠায় বেশ কিছু কেসসা-কাহিনী ইবনে বাবওয়ায় এবং ইকমালুদ্দিন ও ইত্মামুন নি'মাত গ্রন্থদ্বয়ের বরাতে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এ সবগুলোই আজে-বাজে গাল-গল্ল। এ কিতাবটিতে কেবল এটুকু সত্য তথ্য রয়েছে যে, গ্রন্থকার স্বীকার করেন, ইউয় আসফ একজন পর্যটক নবী ছিলেন এবং শাহ্যাদাহ ছিলেন যিনি কাশ্মীরে এসেছিলেন। এই শাহ্যাদাহ নবীর মায়ারের ঠিকানা হচ্ছে, জামে মসজিদ থেকে যখন রওয়া বাল ইয়ামীনের রাস্তায় আসবেন, তখন একটু সামনেই এই মায়ার পাবেন। এ কবরস্থানের বাঁ দিকের দেয়ালের পেছনে একটা রাস্তা আছে এবং ডান দিকে একটি পুরান মসজিদ রয়েছে। মনে হয় তাবারুক-স্বরূপ পুরান কালে এই মায়ার শরীরের নিকটে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। এ মসজিদটির সংলগ্ন মুসলমানদের বাড়ী-ঘর রয়েছে। অন্য কোন জাতির সেখানে কোন নাম-গন্ধ নেই। আল্লাহর এই নবীর

\* টীকা ৪ সোলায়মান বলতে সোরায়মান নবীকে বুবায় তা জরুরী নয়, বরং প্রতীয়মান হয় যে, কোন ইস্রাইলী আমীর হতে পারেন যার নামে পাহাড়টি প্রসিদ্ধি পেয়েছে। এ আমীরের নাম সোলেমান হতে পারে। নবীদের নামে এখনও নাম রাখার রীতি ইহুদীদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে। মোটকথা, এ নামটি থেকেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহুদীদের গোত্র কাশ্মীরে এসেছিল যাদের জন্য হ্যরত সৈসা (আ.)-এর কাশ্মীরে আগমন জরুরী ছিল - এস্থকার

কবরের ডান কোনায় একটা পাথর রাখা আছে যাতে মানুষের পায়ের ছাপ আছে। কথিত যে, এটা রসূলের পায়ের ছাপ। যথাসম্ভব ঐ শাহ্যাদাহ নবীরই পায়ের এ ছাপ চিহ্নপে রয়ে গেছে। এ কবরটিতে কোন কোন গোপন রহস্যের প্রকৃত স্বরূপকে হাতছানি দেয় এমন দুঁটি বিষয় রয়েছে। এক, সেই ছিদ্র-পথ যা কবরটির পাশে বিদ্যমান। দুই, ঐ পায়ের ছাপ যা পাথরের ওপর রয়েছে। মায়ার সম্পর্কিত বাদবাকি তথ্য মায়ারের সংযুক্ত নকশাটিতে দেখানো হয়েছে। ইতি-



হ্যরত ঈসা (আ.) যিনি ইউমু, যীমু ও যেয়াস এবং ইউয আসফ নামেও খ্যাত এটি তার মায়ার এবং কাশীরের বয়োবৃন্দ লোকদের সাক্ষ্য অন্যায়ী প্রায় উনিশ 'শ' বছর ধরে এ মায়ারটি শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় অবস্থিত।

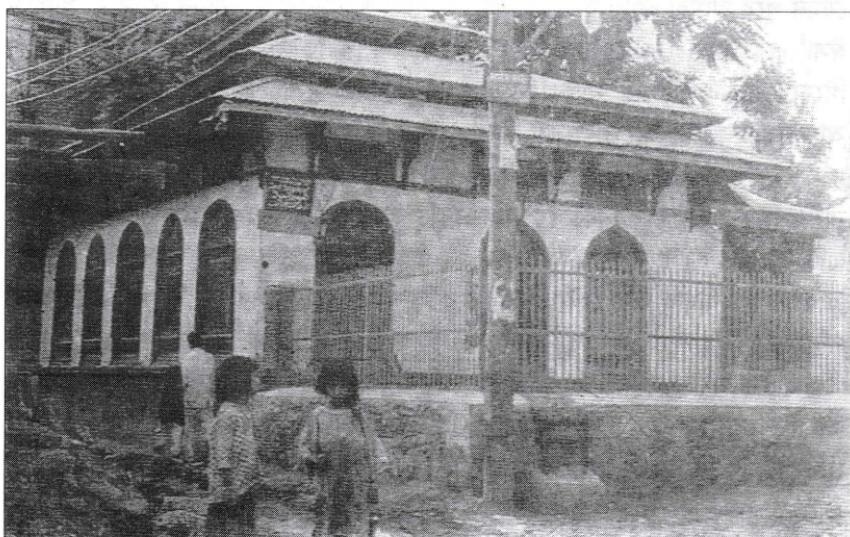
## উপসংহার

খোদা তাআলার অনুগ্রহে বিরুদ্ধবাদীদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য এবং এ গ্রন্থকারের সত্যতা প্রকাশার্থে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, কাশ্মীরের শ্রীনগরে খান ইয়ার মহল্লায় ইউয় আসফের নামে যে কবর রয়েছে তা নিঃসন্দেহে হ্যরত ঈসা (আ.)-এর কবর। হ্যরত ঈসার (আ.) ক্ষতঙ্গানে ব্যবহৃত যে মলমটি ‘মরহমে ঈসা’ নামে রয়েছে যার সম্পর্কে হেকেমী চিকিৎসা শাস্ত্রের এক হাজার বরং এরও অধিক সংখ্যক গ্রন্থ সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা এ কথার প্রথম প্রমাণ যে, হ্যরত মসীহ (আ.) ক্রুশে বিন্দ হয়ে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি ক্রুশে বিন্দ হয়ে কখনও মারা যান নি। এ মলমের বিবরণ দিতে গিয়ে চিকিৎসাবিদগণ সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, ‘এ মলমটি আঘাত ও পতন জনিত কাটা-ছেঁড়া এবং প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতের জন্য তৈরী করা হয় এবং হ্যরত ঈসা (আ.)-এর ক্ষতঙ্গলোর জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল অর্থাৎ ঐ জখমের জন্য যা তাঁর হাতে ও পায়ে ছিল’। এ মলমটির প্রমাণস্বরূপ আমার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু সংখ্যক এমন পাত্রলিপি রয়েছে যা প্রায় সাত শ’ বছর পূর্বের। এ চিকিৎসাবিদগণ কেবল মুসলমানদের মধ্য থেকেই নন, বরং তাদের মধ্যে ঝীষ্ঠান, ইহুদী ও মজুসী (অগ্নি উপাসক পার্সি)-গণও রয়েছেন। তাঁদের প্রণীত গ্রন্থগুলো এখনও মজুদ রয়েছে। রোমক স্মার্ট সিজারের গ্রন্থাগারেও রোমান ভাষায় একটি ‘কারবাভীন’ (ঔষধাদির ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত গ্রন্থ)-ও ছিল। ক্রুশের ঘটনার পর দু’শ বছরের মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ দুনিয়াতে প্রকাশ ও বিস্তার লাভ করেছিল।

হ্যরত ঈসা (আ.) যে ক্রুশে মারা যান নি এ বিষয়টির ভিত্তি প্রথমত: স্বয়ং ইঞ্জিল, যেমন পূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি। তারপর জ্ঞানমূলক গবেষণার আকারে ‘মরহমে ঈসা’ এর প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে। এরপর সম্প্রতি তিব্বত থেকে যে ইঞ্জিল পাওয়া গিয়েছে সেটি পরিক্ষার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) সুনিশ্চিত ভারতবর্ষে আসেন। অতঃপর আরও অনেক কিতাব থেকে এ ঘটনার সত্যতা জানা গিয়েছে। প্রায় দু’শ বছর পূর্বের রচিত গ্রন্থ ‘তারিখে-কাশ্মীর উয়্যমা’-এর ৮২ পৃষ্ঠায় লিখা আছে: ‘সৈয়দ নাসীরুন্নিনের মায়ারের নিকট যে অন্য একটি কবর রয়েছে এর সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস, এটি একজন নবীর কবর’। অতঃপর সে একই ইতিহাসবিদ উক্ত পৃষ্ঠাতেই লিখেন: ‘একজন শাহ্যাদাহ অন্য কোন দেশ থেকে কাশ্মীরে এসেছিলেন। তিনি খোদাভীরুতা ও পবিত্রতায়, ইবাদতে ও আত্মবিলীনতায় পূর্ণাঙ্গ স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই খোদার পক্ষ থেকে নবী ছিলেন। কাশ্মীরে এসে তিনি কাশ্মীরিদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাতে ব্যাপ্ত হন, তাঁর নাম ইউয় আসফ। অধিকাংশ দিব্যদর্শন (কাশ্ফ) লাভকারীগণ বিশেষতঃ মুল্লা ইন্যায়তুল্লাহ-যিনি এ লেখকের পীর ও মুর্শেদ তিনি বলে গেছেন, এ কবর থেকে নবুওয়তের কল্যাণ ও আশিস প্রকাশিত হচ্ছে’। এ উদ্ধৃতিটি

ফার্সি ভাষায় রচিত গ্রন্থ ‘তারিখে উয়মা’তে রয়েছে। এর তরজমা দেয়া হলো। তেমনি ‘মোহামেডান এঙ্গলো ওরিয়েটাল কলেজ ম্যাগাজিন’ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ইং ও অক্টোবর ১৮৯৬ইং সংখ্যায় নেয়াম হায়দ্রাবাদের সেনাবাহিনীর সার্জন মির্যা সাফদার আলী সাহেব প্রণীত কিতাব ‘শাহ্যাদাহ ইউয় আসফ’ এর-ওপর পর্যালোচনাস্বরূপ লিখেছে: ‘ইউয় আসফের প্রসিদ্ধ জীবন-বৃত্তান্ত যা এশিয়া ও ইউরোপে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছে তাতে পাদ্রীগণ সংযোজন-সংমিশ্রণ করেছেন অর্থাৎ তাতে ইউয় আসফের জীবন-বৃত্তান্ত ও হয়রত মসীহ ঈসার শিক্ষা ও নৈতিক গুণাবলীর মাঝে যে সাদৃশ্য রয়েছে তা হয়তো পাদ্রীরা নিজে থেকে সংযোজন করেছেন’। কিন্তু এ ধারণা নিছক সরলতা ও অজ্ঞতাপ্রসূতই বটে। কেননা সারা ভারতবর্ষে বিশেষতঃ কাশ্মীরে ইউয় আসফের জীবন-বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধি লাভ করার পরই পাদ্রীরা তা জানতে পেরেছেন। এছাড়াও এদেশের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে এবং ঐ গ্রন্থগুলো আজও বিদ্যমান। কাজেই পাদ্রীদের পক্ষে তাতে সংযোজন-সংমিশ্রণ করার সুযোগ কোথায়! অনুরূপ, পাদ্রীদের এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল যে, হয়তো মসীহৰ শিষ্যরা এদেশে এসে থাকবেন এবং তারাই ইউয় আসফের জীবন-বৃত্তান্তে এগুলো লিখে গেছেন। কেননা আমরা প্রমাণ করে এসেছি, ইউয় আসফ ‘ইউসু’ (سُوئْل) হয়রত ঈসারই নাম, যা ভাষার তারতম্যের কারণে কিছু বদলে গেছে। তদুপরি এখনও কাশ্মীরীদের অনেকে ইউয় আসফের বদলে ঈসা-ই (আ.) বলে থাকেন, যেমন পূর্বেই লিখা হয়েছে।

‘ওয়াস্ সালামু আলা মানিভাবাআল হুদা’ (-যে ব্যক্তি সত্য পথনির্দেশনাকে অনুসরণ করে তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।



৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রথম পৃষ্ঠা সম্পর্কিত টীকা

## তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনা

ڈلت صادقِ مجوہ لے বে তৈরি : نিল হে হে গুরুন্মুখী শুদ্ধুরিজ

শায়খ মুহম্মদ হুসেন বাটালবী বার বার এটাই বলতে থাকেন, ‘সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মাঝে পরখ করার জন্য আমরা মুবাহালা চাই। ইসলাম ধর্মে মুবাহালা রসূলুল্লাহ (স.)-এর অনুসৃত রীতি (সুন্নত) সম্মতও বটে, কিন্তু সেই সাথে এ-ও আমার আবেদন যে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে আমার ওপর আযাব অবর্তীর্ণ হোক।’ এর উভরে আমি ২১ নভেম্বর, ১৮৯৮ইং তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে সবিস্তারে লিখে দিয়েছি যে, মুবাহালায় তাৎক্ষণিক আযাব নাযেল হওয়া সুন্নতের সম্পূর্ণ বরখেলাপ। হাদীসাবলীতে আজও ‘লামা হালাল হওলু’ কথাগুলো মজুদ রয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘নাজরানের খ্রীষ্টানরা ভয় পেয়ে মুবাহালা পরিহার করেছে, কিন্তু তারা যদি আমার সঙ্গে মুবাহালা করতো তাহলে এক বছর পার হওয়ার আগেই তাদেরকে ধ্বংস করা হতো।’ অতএব এ হাদীস অনুযায়ী মুবাহালার জন্য এক বছর পর্যন্তের মেয়াদকালের শর্ত হচ্ছে আঁ হ্যারত (স.)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী আর এটাই মুসলমানদের জন্য সুন্নত অনুমোদিত পদ্ধতি। হাদীসে বর্ণিত ফরমানের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে মুবাহালার মেয়াদকালকে এক বছরের চেয়ে কম করা উচিত নয়। বরং খোদাতাআলার সত্যপ্রায়ণ ও তত্ত্বদর্শী বুর্যুর্গ বান্দাগণ যারা পৃথিবীর বুকে হুজ্জাতুল্লাহ (আল্লাহর অকাট্য যুক্তি) স্বরূপ হয়ে আসছেন তারা সবসময়ের ন্যায় এখনও নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উত্তরাধিকারী হয়ে এ মো'জেয়ারও উত্তরাধিকারী। কোন খ্রীষ্টান যে ঈসা (আ.)-কে খোদা মানে\*

\* টীকা : ইঞ্জিল থেকে প্রমাণিত যে, নিদর্শন দেখানোর বরকত হ্যরত মসীহর যুগে খ্রীষ্টান ধর্মে বিদ্যমান ছিল, বরং নিদর্শন দেখানো সত্ত্বিকার খাঁটি খ্রীষ্টানের পরিচয়-চিহ্নস্বরূপ ছিল। কিন্তু যখন থেকে খ্রীষ্টানরা মানুষকে খোদা বানায় ও সত্য রসূলকে (স.) প্রত্যাখ্যান করে তখন থেকে এ সকল বরকত তাদের থেকে উঠে যায় এবং অন্যান্য মৃত ধর্মগুলোর ন্যায় এ ধর্মটিও মৃত হয়ে পড়ে। সে কারণেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন খ্রীষ্টান নিদর্শন দেখাবার উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে পারে না।

অথবা অন্য কোন মুশরেক যে অন্য কোন মানুষকে খোদারপে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে সে ব্যাপারে মুবাহালা করলে খোদা তাআলা উল্লেখিত এ মেয়াদের মধ্যে অথবা ইলহামের মাধ্যমে ইলহামপ্রাণ্ত ব্যক্তিকে জানানো অন্য কোন মেয়াদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিকে তাঁর প্রতাপ ও সত্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোন ঐশ্বী-নির্দর্শন দেখাবেন। এটা ইসলামের সত্যতার জন্য এমন চিরস্থায়ী নির্দর্শনস্বরূপ অন্য কোন জাতি যার মোকাবেলা করতে পারবে না। মোটকথা, এক বছরের মেয়াদ যে ভৌতিকদর্শনমূলক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে এক ন্যূনতম মেয়াদকাল তা শরীয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর দ্বারা প্রমাণিত। আর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব চাওয়ার হঠকারিতা কেবল সে ব্যক্তিই করতে পারে যে প্রকৃতপক্ষে হাদীসের জ্ঞান সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। এরূপ ব্যক্তি মৌলবী বা আলেম হওয়ার মর্যাদাকে কলঙ্কিত করে। আমি তো বাটালবী সাহেবকে বুঝাবার জন্য এ-ও লিখে দিয়েছিলাম যে, মুবাহালায় কেবল এক পক্ষ থেকে বদ-দোয়া হয় না, বরং উভয় পক্ষ থেকে বদ-দোয়া হয়ে থাকে।

অতএব কোন পক্ষ যদি নিজেকে মুমিন মুসলমান বলে এবং অপর পক্ষকে কাফির, দাজ্জাল, ধর্মহীন, অভিশপ্ত ও মুর্তাদ (ধর্মত্যাগী) আখ্যা দিয়ে ইসলামের গণীবহির্ভূত করে যেমন মৌলবী মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী করে থাকেন, তাহলে কে তাকে নিজের জন্য তাৎক্ষণিক আযাবের বদ-দোয়া করতে নিষেধ করেছে? কিন্তু মুলহাম (ইলহামপ্রাণ্তির অধিকারী ব্যক্তি) তার ইচ্ছার তাঁবেদার হতে পারেন না। মুলহাম তো খোদা তাআলার ইলহামের তাঁবেদারী করবেন। কিন্তু ২১ নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখে আমার যে বিজ্ঞপ্তি শেখ মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ও তার দুই দোসরের মুকাবিলায় মুবাহালারপে প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে কেবল এক দোয়া যার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু যে, মিথ্যাবাদী খোদা তাআলার পক্ষ থেকে লাঞ্ছিত হোক। এর অর্থ এ নয় যে, মিথ্যাবাদী (শৈষ্ঠ) মরে যাক বা কোন ছাদ থেকে পড়ে যাক। যেহেতু মুহাম্মদ হুসেন, জাটলি ও তিবতি মিথ্যারোপ, অভিসম্পাত ও গালিগালাজের মাধ্যমে আমার লাঞ্ছনা চেয়েছে, সেজন্য আমি আল্লাহর নিকট এটাই চেয়েছি, আমি যদি প্রকৃত পক্ষে লাঞ্ছনার যোগ্য, মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও লান্তি হয়ে থাকি যেমন এসব গালমন্দের দ্বারা মুহাম্মদ হুসেন তার পত্রিকার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরে ফেলেছে এবং বার বার আমাকে মন:কষ্ট দিয়েছে, তাহলে আমাকে যেন আরও অপমান করা হয় এবং শেখ মুহাম্মদ হুসেন যেন খোদা

তাআলার পক্ষ থেকে সম্মান ও বড় বড় পদমর্যাদা পায়। কিন্তু আমি যদি মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল ও অভিশপ্ত না হয়ে থাকি, তাহলে এক-অদ্বীতীয় আল্লাহর দরবারে আমার ফরিয়াদ, আমার অবমাননাকারী শেখ বাটলী, জাটলী ও তিবরতীকে যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। মোটকথা, আমি খোদা তাআলার নিকট যালেম, অত্যাচারী ও মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা চাই, তা আমাদের উভয় পক্ষের যে-কেউ হোক। এর ওপরে আমি ‘আমীন’ পড়ছি। আমার প্রতি এ ইলহাম (ঐশীবাদী অবতীর্ণ) করা হয়েছে যে, এ দু’পক্ষের মধ্যে যে পক্ষই সত্যসত্যি খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যালেম ও মিথ্যাবাদী, তাকে খোদা লাঞ্ছিত করবেন। আর তা বাস্তবত: ১৫ জানুয়ারী, ১৯০০ পর্যন্ত ঘটে যাবে। খোদা তাআলাই সবচেয়ে ভাল জানেন, তাঁর দৃষ্টিতে কে যালেম ও মিথ্যাবাদী। যদি (বেঁধে দেয়া) এ সময়ের মধ্যে আমার লাঞ্ছনা প্রকাশ পেয়ে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে আমার মিথ্যাবাদী, যালেম ও দাজ্জাল হওয়া প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর এভাবে জাতির নিত্যকার ঝগড়া মিটে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শেখ মুহাম্মদ হুসেন, জাফর জাটলী ও তিবরতীর প্রতি আসমান থেকে (অপার্থিব উপায়ে) লাঞ্ছনা অবতীর্ণ হয়, তাহলে এটা এর অকাট্য প্রমাণ হবে যে, তারা আমাকে গালিগালাজ করাতে এবং দাজ্জাল, অভিশপ্ত ও চরম মিথ্যাবাদী বলাতে আমার প্রতি যুলুম করেছে। কিন্তু শেখ মুহাম্মদ হুসেন ২১ নভেম্বর, ১৮৯৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত আমার প্রতি আরবী (ভাষায় অবতীর্ণ) ইলহামের ওপর, অর্থাৎ তাতে বর্ণিত ‘আ তা ’জাবুলি-আমরি’ বাক্যটির ওপর যখন আপত্তি উত্থাপন করে তখন সে নিজের জন্য লাঞ্ছনার দ্বার নিজেই খুলে দেয়। অন্য কথায়, তাৎক্ষণিকভাবে তার লাঞ্ছিত হবার আকাঙ্গা সে নিজ হাতেই পূরণ করে। অথচ তার লাঞ্ছনা তো ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৮ তারিখ থেকে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল। তার আগেই সে এক লজ্জাক্ষর লাঞ্ছনা মাথায় তুলে নিল, যাকে তাৎক্ষণিকই নয়, বরং অগ্রিম লাঞ্ছনা বলা উচিত। তা হলো একপে যে উক্ত শেখ উদ্ভৃত ইলহামটি দেখে কোনো এক উপলক্ষ্যে একই শহরের অধিবাসী শেখ গোলাম মুস্তাফা সাহেবের সামনে এর সম্পর্কে আপত্তি করলেন, বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ভৃত যে ইলহামী বাক্যটি রয়েছে অর্থাৎ ‘আ তা ’জাবুলি-আমরি’ এতে ‘নাহবী’ (-আরবী ব্যাকরণগত) ভুল রয়েছে, অথচ খোদার বাণী ভুল হতে পারে

না। বাক্যটি বরং ‘আ তা’জাৰু মিন আমৱি’ হওয়া উচিত।’ এ সেই আপত্তি যার দক্ষন তাৎক্ষণিকভাবে শেখের ভাগ্যে লাঞ্ছনা জুটেছে। কেননা নামকরা কবিগণ বরং জাহেলিয়াতের (প্রাগ ইসলামিক) যুগের অত্যন্ত উঁচু স্তরের খ্যাতিমান কবিদের রচিত কাব্য থেকে আমরা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, ‘আজেবা’ শব্দের সংশ্লিষ্ট ‘সিলাহ’ (অব্যয়) ‘লাম’-ও হয়ে থাকে। এখন, প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, স্বনামধন্য শেখ সাহেব এ আপত্তি উত্থাপনের দ্বারা যা তার চরম পর্যায়ের জ্ঞানাভাব ও অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে, জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নিজের দুর্বলতা নিজ হাতে ফাঁক করে দিয়ে নিজের চরম সম্মানহানি ঘটালেন ও শক্র-মিত্র প্রত্যেকের কাছেই প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি কেবল একজন নামের মৌলবী ও উঁচু স্তরের আরবী জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। ‘মৌলবী’ বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি আসল মৌলবীয়তের প্রকৃত গুণাবলী থেকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে বঞ্চিত হয় তাহলে তার জন্য এর চেয়ে বেশি লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে! আফসোস এ ব্যক্তির এখনও জানা নেই যে, এ ক্রিয়াটির অর্থাৎ ‘আজেবা’ শব্দের ‘সিলাহ’ কথনও ‘লাম’ শব্দের দ্বারা আসে, আবার কথনও এর ‘সিলাহ’ মিন-ও হয়। একটি বালক, যে মাত্র ‘হেদায়াতুন নাহভ’ পুস্তক পর্যন্ত পড়েছে সে-ও জানে, আরবীয় ব্যাকরণবিদরা এ শব্দের জন্য যেমন ‘লামে’র সিলাহ প্রয়োগ করেছেন, তেমনি ‘মিন’ এরও। সুতরাং এ সিলাহৰ সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে যে সব আরবী কবিতার পংক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে:

عَجِبَتْ مُولُودِ لِيْسَ لَهُ أَبٌ وَمَنْ ذَرَ دِلْبِسَ لَهُ بُوْان -

(‘আজিবতু লি-মাওলুদিন লাইসা লাভ আবুন/ওয়া মিন যি-ওলাদিন লাইসা লাভ আবাওয়ানি।’)

কবি এ পংক্তিটিতে উভয় সিলাহৰ উল্লেখ করেছেন, ‘লাম’-এরও এবং ‘মিন’-এরও। ‘দিওয়ান হিমাসাহ’ যা সরকারী কলেজগুলোতে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং এর ফাসাহাত ও বালাগাত সর্বশীকৃত, এ গ্রন্থের ১৯, ৩৯০, ৪১১, ৪৭৫ ও ৫১১ পৃষ্ঠায় জা’ফর বিন উল্বাহ ও অন্যান্য কবিদের পাঁচটি পংক্তি লিখা আছে। এগুলোতে আরবের নামজাদা কবিরা ‘আজেবা’ শব্দের সিলাহ ‘লাম’ রেখেছেন:

”، عَجِبَتْ لِلْمُؤْمِنَاتِ إِذْ تَخْتَصُّنَتْ - إِنَّ بَابَ السُّجُونِ دُنْيَانُكُنْ (١) عَجِبَتْ لِسُعْيِ الدَّهْرِ بِنِي وَدِينِهَا - فَلَمَّا اتَّقْفَنِي  
مَا يَعْنِنِي سَكِنُ الدَّهْرِ (٢)، عَجِبَتْ لِبُرْئَتِي مِنْكَ يَا تَزَّيْدَهَا عَمَّا زَمَانَنِي عَمَّا يَعْرِجُونِي (٣)، عَجِبَتْ لِعِبْدَاتِ  
مَجْوَنِي سَفَاهَةَهُ - إِنَّ أَصْطَبْكُوهُ مِنْ شَأْنِمْ وَتَقْيِلُوا (٤) عَجِبًا لِأَحْمَدَ وَالْجَمَاعُ جَمَّةَ - إِنَّ  
يَلْوُمَ عَلَى الزَّمَانِ تَبَّةَهُ -

[(1) আজিবতু লি-মাসরাহা ও আন্না তাখান্নাসাত/ইলাইয়া ওয়া বাবুস সিজনি দুনি মুগ্লাকু। (2) আজিবতু লি সা'য়েদ দাহরি বাইনি ওয়া বাইনাহা/ফা-লাম্মান্কায়া মা বাইনানা সাকানাদ দাহরু। (3) আজিবতু লি বুরযী মিনকে ইয়া ইয়্যু/ বা'দা মা আমিরতু যামানান মিনকে গাইরা সহীহিন (4) আজিবতু লি-আবদিন আন হাজাওনি সাফাহাতান/আন ইস্তাবহ মিন শায়িহিম ওয়া তাকাইয়ালু। (5) আজাবাল্ লি-আহমাদা ওয়াল আজায়িবু জুম্মাতুন/আন্না ইয়ালুমু আলায যামানি তাবায্যালি।]

সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান দৃষ্টান্তটি হচ্ছে মিশকাত, কিতাবুল ঈমানে ৩ পৃষ্ঠায় ইসলামের অর্থ সম্পর্কে নবী করীম (স.)-এর যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে- যা মুস্তাফাকুন আলায়হে-ও বটে অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিমেও এসেছে, এতে ‘আজাব’ শব্দের সিলাহ ‘লামের’ মাধ্যমে এসেছে। হাদীসটির শব্দগুলো হচ্ছে : ‘আজিবনা লাহ ইয়াস্যালুহ ওয়া ইউসান্দিকুহ’ (অর্থাৎ সেই আগস্তকের প্রতি আমরা অবাক হলাম, সে পশ্চাত করছিল এবং সত্যায়নও করছিল -অনুবাদক)। দেখ, এ জায়গায় ‘আজিবনা’ এর সিলাহ ‘মিন’ নেই, বরং ‘লাম’ আছে। সাহবাগণ ‘আজিবনা মিনহ’ বলেননি, বরং ‘আজিবনা লাহ’ বলেছেন। এখন বাটালবী সাহেবে বলুন, বিদ্বান ও জ্ঞানীদের কাছে মৌলবী বলে পরিচিত এমন ব্যক্তির লাঙ্ঘনা এটাই, না কি এর নাম অন্য কিছু? আর এ ফতওয়াও দিন, এ লাঙ্ঘনাটাকে তৎক্ষণিক লাঙ্ঘনা বলা উচিত, না কি এর অন্য কোন নাম রাখা উচিত? বিদ্বেষপরায়ণ শেখ বাটালবী তার বিদ্বেষের আতিশয়ের দরজন নিমিষে নিজেকে এ পংক্তিটির প্রতীক বানিয়ে নিয়েছেন : ‘মোরা খোয়ান্দি ও খুদ বা দাম আম্দি/নায়ার পুর্খতা তার কুন কেহ খাম্ আম্দি।’

লক্ষ্য করা উচিত, আমার লাঞ্ছনা আকাঞ্চ্ছা করতে গিয়ে নিজের লাঞ্ছনা নিজেই কিরূপ প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিলেন। কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষ কি এমন ব্যক্তির ঘোলবী (আলেম) নাম রাখতে পারে, যে মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীসটির খবর রাখে না ও ইসলামের পরিচিতির ভিত্তিস্বরূপ হাদীসটির শব্দগুলোও জানে না এবং যে বিষয়টি স্পষ্টতঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত সে সম্পর্কে চুল-দাঢ়ি সাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও অবহিত নয়? অতএব যে ব্যক্তির আরবী জ্ঞানের এহেন অবস্থা এবং হাদীস সম্পর্কে যার জ্ঞানের এরূপ দৈন্যদশা যে মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীসটির শব্দগুলো সম্পর্কেই অজ্ঞ, তার অবস্থা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত করুণ। তার লাঞ্ছনা কোনও চেষ্টার দ্বারা ঢেকে রাখার উর্ধ্বে। তার এ লাঞ্ছনা নিঃসন্দেহে তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনা যা তার কামনা ও অনুরোধ অনুযায়ী প্রকাশিত হলো। সে নিজ মুখে তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনাকেই চায়। খোদা তাআলা তাই দেখিয়ে দিলেন।

আমরা লিখে এসেছি, কারও মৃত্যু বা হাত পা ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে উল্লেখিত ইলহামের কোন সম্পর্ক নেই। এটি কেবল মিথ্যাবাদীর লাঞ্ছনা প্রকাশার্থে নির্ধারিত। সুতরাং লাঞ্ছনা প্রকাশের জন্য খোদা তাআলার আরও কোনো বড় নির্দর্শনের পূর্বে সাম্প্রতিক এ লাঞ্ছনাটাও মিথ্যাবাদীর জন্য খোদা তাআলার হাতের একটি চাবুকস্বরূপ। আর ‘আ তা’জাবু লি-আমরি’ (আমার আদেশের জন্য অবাক হচ্ছো? -অনুবাদক) ইলহামটিতে প্রকৃতপক্ষে একটি তত্ত্ব নিহিত ছিল। তা হলো, ইলহামটিতে মুহাম্মদ হসেন বাটালবীর জন্য গোপন একটি ভবিষ্যত্বাণী ছিল, যাতে ইঙ্গিতস্বরূপ বর্ণিত ছিল যে, মুহাম্মদ হসেন উল্লেখিত ইলহামের আরবী বাক্যটির ওপর আপত্তি করবে। বস্তুত এর অর্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মদ হসেন! তুমি কি ‘লি-আমরি’ শব্দের জন্য আশ্চর্য হচ্ছো এবং আমার ইলহামের এ বাক্যটিকে ভুল সাব্যস্ত কর? এর সিলাহ ‘মিন’ বলতে চাও? দেখ, আমি তোমার নিকট প্রমাণ করে দিব, আমি আমার খাঁটি প্রেমিকদের সাথে রয়েছি এবং তোমার লাঞ্ছনা প্রকাশ করবো।’ সুতরাং ঐ লাঞ্ছনাই এখন প্রকাশিত হলো। তবে এখানেই শেষ নয়। কেননা মুহাম্মদ হসেন বাটালবী ও তার বন্ধুরা এ লাঞ্ছনাকে হালওয়ার ন্যায় হজম করে ফেলবে অথবা মায়ের দুধের মত করে গিরে ফেলবে। কাজেই, ঐ লাঞ্ছনা যা মিথ্যাবাদী ও যালিমের জন্য আসমানে প্রস্তুত করা আছে তা এর চেয়ে অনেক বড়। খোদা তাআলা আমাকে ইলহাম করেছেন:

‘জ্যাটু সাইয়েয়াতিম বি-মিসলিহা’ (অপরাধের শাস্তি এ অপরাধের সমান সমান-অনুবাদক)। অতএব যদি আমাকে অন্যায়ভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আমি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে এমন লাঞ্ছনাকারী নির্দর্শন দেখার আশা রাখি যা মিথ্যাবাদী, যালেম, মিথ্যারোপকারী ও দাজ্জালকে লাঞ্ছিত করার জন্য নির্ধারিত। যদি আমিই ওরূপ হয়ে থাকি তাহলে আমিই লাঞ্ছিত হবো। তা না হলে উভয় পক্ষের মাঝে যে প্রকৃতপক্ষে যালেম ও মিথ্যাবাদী সে এই লাঞ্ছনার স্বাদ ভোগ করবে। সুতরাং এহেন জ্ঞান-স্বল্পতার স্বরূপ উন্নোচন ছাড়াও মুহাম্মদ হুসেন ও তার দলকে আরও একটি তাৎক্ষণিক লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয়েছে। আর তা হলো, সন্দেহাতীত সত্য ঘটনাবলীর দ্বারা চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, হ্যরত ঈসা (আ.) ক্রুশেও মারা যান নি, আকাশেও উঠে যান নি, বরং ইহুদীদের পক্ষ থেকে ক্রুশের মাধ্যমে হত্যার পরিকল্পিত চেষ্টার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ভারতবর্ষে আসেন এবং অবশেষে একশ’ বিশ বছর বয়সে শীনগর কাশ্মীরে ইন্দ্রকাল করেন। অতএব এটা মুহাম্মদ হুসেন বাটালবী ইত্যাদির জন্য ভয়ানক শোকের এবং মারাত্মক লাঞ্ছনার কারণ -গ্রন্থকার।



## Raaz-i-Haqiqat

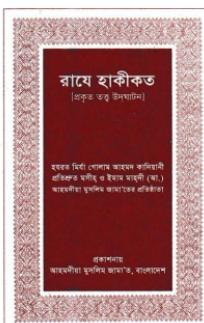
[The Secret of the Truth]

This book (published on 30th November 1898) narrates the biography of Jesus Christ<sup>as</sup> and also explains the real aim of the prayer duel Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> had been asking for.

At the very outset Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> draws the attention of his followers that the prayer duel with Maulvi Mohammad Hussain is to mature on 15th January 1900, they should, therefore, be on the look out for the result of this duel. He admonishes the members of the Jamaat to stick to Taqwa (fear and love of Allah) and not to answer the abuses of the opponents with abuses. He tells them that truth is always weak in the beginning but it is always destined to gain strength. He cites the life of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, in Mecca the enemy where was very strong. Later on the Holy Prophet<sup>sa</sup> won a victory over his enemies.

In the epilogue of the book Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad<sup>as</sup> says that he is grateful to God that it has been proved that the tomb which is in Khan Yar, Srinagar and is said to be the tomb of Yuz Asaf, is really the tomb of Jesus Christ<sup>as</sup>; this has helped to prove the truth of his claim greatly.

© Islam International Publications Ltd.



**Raaz-i-Haqiqat** [The Secret of the Truth]

by: **Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian**  
**Promised Messiah & Imam Mahdi<sup>as</sup>**

*Translated into Bengali*  
**Maulana Ahmad Sadiq Mahmud**  
Murabbi Silsila Alia Ahmadiyya

First Edition : October, 2002

Reprint : April, 2012

*Published by*

**Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh**  
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh  
Printed by: **Intercon Associates**, Dhaka

ISBN 9 789849 91038-1



9 789849 910381